হিন্দুধর্ম শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক

বিষ্ণু দাশ

ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার

ড. শিশির মল্লিক

শিখা দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণির **হিন্দুধর্ম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধানসমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দুধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলি যেমন– সততা, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	
	প্রথম পরিচ্ছেদ : স্রষ্টার স্বরূপ ও উপাসনা	১–১২
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সেবা	১৩–১৮
দ্বিতীয়	হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, উৎপত্তি ও বিকাশ	
	প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস	১৯–৩২
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩৩–৪২
তৃতীয়	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান	৪৩–৫০
চতুর্থ	হিন্দুধর্মে সংস্কার	৫১–৬০
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা	৬১–৭৬
ষষ্ঠ	যোগসাধনা	৭৭–৮৯
সপ্তম	ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা	৯০–১০০
অষ্টম	ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা	১০১–১০৭
নবম	ধর্মপথ ও আদর্শ জীবন	১০৮–১২২
দশম	অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত	১২৩–১৫১

প্রথম অধ্যায়
স্রষ্টা ও সৃষ্টি
প্রথম পরিচ্ছেদ : স্রষ্টার স্বরূপ ও উপাসনা

যিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা, সর্বশক্তির উৎস, যাঁর উপরে কেউ নেই, তিনিই পরম পিতা। তিনিই পরম স্রষ্টা। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্তা। সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের চেতনায় তাঁকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান।

স্রষ্টাকে উপাসনার মাধ্যমে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আমাদের সকল কাজে গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা তাঁর স্বরূপ, সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা, তাঁর গুণ ও শক্তিরূপে দেব-দেবীর পরিচয়, তাঁকে উপাসনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা এবং উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- নিরাকার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা ও অবতাররূপে স্রষ্টার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ও সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দেব-দেবী ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ– এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বর উপাসনার ধারণা, ধরন (নিরাকার ও সাকার) ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং এর অর্থ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি প্রার্থনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং অর্থ বলতে ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব এবং ঈশ্বরের উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হব;
- ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা ও প্রার্থনা মন্ত্র অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : স্রষ্টার স্বরূপ–ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার

সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে এ সকল নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.১. ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

ব্রহ্মরূপে স্রষ্টার স্বরূপ

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ, 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম'। যাঁর থেকে বড় কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শুধু প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকেই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষাও করে থাকেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। আমরা জানি, ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়।

ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ এবং তিনি নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি অজ, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত। ব্রহ্মকে 'ওঙ্কার' বলা হয়। ওঙ্কার সংক্ষেপে ওঁ। এর পূর্ণরূপ অ-উ-ম। এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম।

ঈশ্বররূপে স্রষ্টার স্বরূপ

ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামেও ডাকা হয়। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। তিনি অনন্তরূপী। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
> ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌।
> বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
> ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ। (১১/৩৮)

অর্থাৎ 'তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়স্বরূপ, তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞাতা। তুমি একমাত্র পরম স্থান। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত' একমাত্র প্রভু। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার এই শ্লোক থেকে সহজেই ঈশ্বরের মহিমা ও শক্তি প্রতীয়মান হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ঈশ্বর অনন্ত অসীম, তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি শাশ্বত। তিনি জগতের আদি কারণ, তিনি বিধাতা। তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ নিজে নিজেই সৃষ্ট হয়েছেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। তিনি সকল

২০১৩

কর্মের ফলদাতা। যে যেরকম কর্ম করে, তিনি তাকে সেরকম ফল দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর নিরাকার। প্রয়োজনে তিনি সাকার হতে পারেন। কারণ অনন্ত তাঁর শক্তি। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। ঋগ্‌বেদ অনুসারে তিনি পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। এ কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতাই বোঝানো হয়েছে। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন।

১.২. স্রষ্টার স্বরূপ : ভগবান ও অবতার

ভগবানরূপে স্রষ্টার স্বরূপ

হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে–যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয় (শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ, ৬। ৫। ৭৯)। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভগবান গুণময় এবং অশেষরূপের আধার। তিনি রসময়, আনন্দময় ও দয়াময়। তিনি তাঁর ভক্তদের বিভিন্নভাবে কৃপা করে থাকেন। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান যেকোনো রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আবার ঈশ্বরাবেশে অপ্রাকৃত লীলা, দাবানল পান, একহাতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ, পাষণ্ড-দলন এবং কঠোর তপস্যা করে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং সকলের মঙ্গল করেন। সামান্য দেহধারী হয়ে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান তাঁর কাছে আসেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা তিনি বহন করেন। মোট কথা ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

অবতাররূপে স্রষ্টার স্বরূপ

হিন্দুধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝানো হয়। এই সকল অবতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। অবতার শব্দটি তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবরূপে মর্ত্যে ঈশ্বরের অবতরণ।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন। যেমনঃ নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরম সত্তা বা পরমেশ্বর থেকে উদ্ভূত সকল অবতারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু অনেকবার অবতার হিসেবে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। বিভিন্ন যুগে ভগবান বিষ্ণু নয়বার অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের শেষে তিনি কল্কিরূপে দশম অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।

বিষ্ণুর দশ অবতার হচ্ছে–

১. মৎস্য

২. কূর্ম

৩. বরাহ

৪. নৃসিংহ

৫. বামন

৬. পরশুরাম

৭. রাম

৮. বলরাম

৯. বুদ্ধ

১০. কল্কি

কল্কি সর্বশেষ অবতার। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী কলিযুগের শেষের দিকে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে সবশেষে আমরা বলতে পারি; ব্রহ্মরূপে স্রষ্টা নিরাকার, নির্গুণ। ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন, তখন তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর নিরাকার, তবে প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, তাঁর কাছে আসেন, নানা রকম লীলা করেন, তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান। আবার মঙ্গলকর কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যখন জীবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলে অবতার। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার আলাদা নয়, এ হচ্ছে একই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

পাঠ ৩ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন, প্রতিপালন করেন, বিপদ-আপদে রক্ষা করেন, প্রয়োজনে সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, দুষ্টের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষাও করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সৎপথে চলতে সহায়তা করেন। যাঁরা সৎপথে চলেন তিনি তাঁদের ভালোবাসেন। তাঁদের উন্নতির পথ দেখান এবং সর্বদা তাঁদের মাঝে বিরাজ করেন। অসৎ ব্যক্তিদের তিনি পছন্দ করেন না এবং শাস্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের রক্ষা করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই অবস্থান করেন। অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন। এ কারণে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিরাজ করছে। স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর জীবকুলের উপর প্রভুত্ব করেন। জীব, বস্তু–সকল কিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টিকে যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টাকেও ভাবা যায় না। নিচে সৃষ্টির শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা বিশদভাবে বর্ণনা করা হলো।

১. অভিভাবক হিসেবে সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা

স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না। এ মহাবিশ্বের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, জীব-জন্তু সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি ঈশ্বর। তিনি অবিনশ্বর এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালনা করছেন এবং রক্ষা করছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য জন্ম ও মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন।

ভালো কাজের জন্য তিনি তাঁর ভক্তদের ভালো ফল দিয়ে থাকেন এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। আবার মহাকাশের নক্ষত্রমালা যে কক্ষচ্যুত হচ্ছে না, তার মূলেও রয়েছে ঈশ্বরের শৃঙ্খলা বিধানের শক্তি। এ সব কিছুই সৃষ্টিকর্তার আদেশে পরিচালিত হচ্ছে। ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রয়ী শক্তিরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু রক্ষা ও প্রতিপালনকারী দেবতা এবং শিব সংহারের দেবতা। এ থেকে বোঝা যায়, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য তাঁর নির্ধারিত ভূমিকা পালন করছেন।

২. সর্বশক্তিমান হিসেবে স্রষ্টার ভূমিকা

মহান ঈশ্বর একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক, একজন অসীম ক্ষমতাধর পরমপুরুষ। তাঁর রয়েছে অসংখ্য মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অগণিত চরণ। তিনি সমগ্র বিশ্বে সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। লক্ষ কোটি গ্রহ, উপগ্রহ এ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে। জীব ও জড় বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। পরম কারণবাদের যৌক্তিকতা থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এক ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিস্ময়কর শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করছেন। কেননা, একাধিক ঈশ্বরের নিয়ম-কানুনগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতো যা সংঘাতের সৃষ্টি করত। অতএব, ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। অনেক ধর্মতাত্ত্বিকের মতে, বিশ্ব কোনো কারণের ফলাফল। পৃথিবী মাটি, জল, আলো বাতাস দ্বারা গঠিত, বা কোনো পরম একক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে তা করা অসম্ভব।

৩. দুষ্টের দমনে স্রষ্টার ভূমিকা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (৪/৭)

পবিত্র গীতার এ শ্লোক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন এ বিশ্বে ধর্ম কমে যায়, অধর্ম বেড়ে যায় তখনই স্রষ্টা জগতে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন । এ সময় তিনি দুষ্টকে শক্তহাতে দমন করেন ।

৪. শাসক হিসেবে ভূমিকা

ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফলাফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফলাফল অশুভ । ভালো ও খারাপ অবচেতনভাবে হৃদয়ে বিরাজ করে । এই চেতনা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একজন শাসকের । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । তিনি ভালো মানুষকে সুখী করেন, অপরাধীদের শাস্তি দেন এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন । অন্তরকে পরিচালিত করা, ন্যায়-অন্যায়কে নির্দিষ্ট করা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয় ।

ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, সকলকে পরিচালনা করেন । ঈশ্বর সকলের প্রভু, সর্বজ্ঞ, নিয়ন্ত্রক, বিশ্বের কারণ, স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী ।

৫. জন্ম ও মৃত্যুর বিধায়ক এবং ভালো কাজের ফলদাতা

হিন্দুধর্মের বেদান্ত দর্শন অনুসারে প্রাণী ও অপ্রাণী যেকোনো বিষয় বা পদার্থ যে-স্থান থেকে জন্মলাভ করে, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে যার কাছে ফিরে যায়, তিনিই ব্রহ্ম বা অক্ষয় শক্তি বা ঈশ্বর । বেদান্তের এই উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বর জীবকুলের সৃষ্টি ও মৃত্যু উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত । ঈশ্বর জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে এ জগতের সকল প্রাণী একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে পরিচালিত হয় । তিনি স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ সৎপথে ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে স্বর্গলাভ করতে পারে । মন্দ কর্ম করলে নরকে যেতে হয় ।

পাঠ ৪ : ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেবদেবী

ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা । অর্থাৎ ঈশ্বর যে তিনটি প্রধান ক্রিয়া সাধন করে থাকেন, তা হলো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় । তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করেন ।

দেবদেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ । ঈশ্বর নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন–যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি । এঁরা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা ধারণ করে রয়েছেন । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু পালনকর্তা, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, শিব প্রলয়ের দেবতা ইত্যাদি । আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দেবদেবীর পূজা করি, ভক্তি করি, তাঁদের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি ।

আগেই বলা হয়েছে, ঈশ্বর বা ভগবান প্রধানত ছয়টি গুণে গুণান্বিত– ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

দেবদেবীগণ পরিপূর্ণ ঈশ্বর না হলেও মহান ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত। কেননা, তাঁরা ঈশ্বরের এক বা একাধিক গুণ বা শক্তি ধারণ করে আছেন। এ কারণে ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পূজারির অভীষ্ট পূরণ করেন।

সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবী এক ঈশ্বরের বিভিন্ন সাকার রূপ। উদাহরণস্বরূপ নিচে কয়েকজন দেবদেবীর ঐশ্বরিক গুণ ও শক্তির বর্ণনা করা হলো–

ব্রহ্মা : ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। তিনি বিশ্ব ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব সৃষ্টি করা ছাড়াও ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি কল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন।

বিষ্ণু : তিনি সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা। এ বিশ্বে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিপদে পড়লে বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে।

শিব বা মহেশ্বর : তিনি সংহার বা প্রলয়ের দেবতা। তিনি সংহার করে সমতা রক্ষা করেন। এ ছাড়াও তিনি দেবতাদের বিপদআপদ থেকে রক্ষা এবং প্রয়োজনে অসুরদের বিনাশ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী। নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার কারণে তাঁকে নটরাজ বলা হয়।

দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তিরূপ। আদ্য শক্তি মহামায়াই বিভিন্ন দেবীরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যেমন– দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী প্রভৃতি। দেবী দুর্গা অসীম শক্তির দেবী, যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সাথে সম্পৃক্ত। দেবী দুর্গাকে এ মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয়।

দেবী কালী : দেবী কালী শাশ্বত ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একদিকে অন্যায় ও অশুভকে ধ্বংস করেন। অপরদিকে মমতাময়ী মা রূপে দেন বরাভয়।

লক্ষ্মী : লক্ষ্মী সৌভাগ্য, ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের দেবী। তিনি আমাদের বিভিন্ন সম্পদ দান করে থাকেন।

সরস্বতী : তিনি বিদ্যা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির দেবী। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে আমরা বিদ্যাশক্তি অর্জন করতে পারি।

গণেশ : সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। যে-কোনো শুভকাজে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করা হয়।

কার্তিক : কার্তিক যুদ্ধের দেবতা, তিনি দেবসেনাপতি। তিনি অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আদর্শ ও সুন্দর সন্তান লাভের জন্য দেবতা কার্তিকের পূজা করা হয়।

শীতলা : তিনি রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী। দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবীও বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। তিনি মহামারি প্রতিরোধ ও প্রাণিকুলকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

পাঠ ৫ : উপাসনা

উপাসনার ধারণা

হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। 'ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ।' ঈশ্বর আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা। সবকিছুই তাঁর থেকে সৃষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। তিনি সর্বশক্তিমান। আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল সব তাঁর হাতে। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। তাঁর গুণগান করি। বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকে বলা হয় উপাসনা। আক্ষরিকভাবে উপাসনা বলতে ঈশ্বরের পাশে অবস্থান করাকে বোঝানো হয়।

প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের জন্য উন্মুখ থাকে। সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই

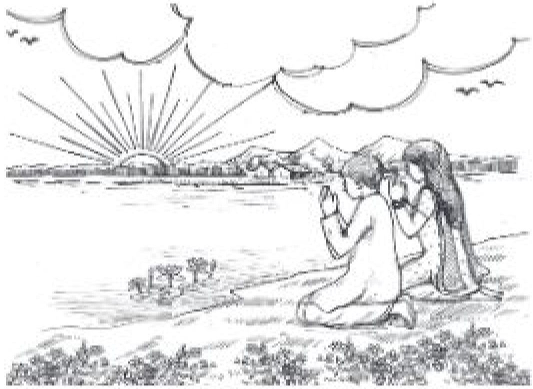

হলো পরম তৃপ্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের বিভিন্ন পথের কথা উল্লেখ রয়েছে। উপাসনা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একটি মাধ্যম বা পথ।

উপাসনার ধরন

উপাসনা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

ক. সাকার উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা

খ. নিরাকার উপাসনা বা নির্গুণ উপাসনা

সাকার উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা : প্রতীক শব্দের অর্থ চিহ্ন বা আকার। মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করে করা হয়। প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নিরাকার উপাসনা : 'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মুলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ করে করা হয় না। নিরাকাররূপ ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাঁকে উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনা করা হয়।

হিন্দুধর্মাবলম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করেছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। (গীতা ৪/১১)

অর্থাৎ যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের সেভাবেই আমি কৃপা করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে। দেবদেবীগণ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। তাই হিন্দুধর্মে একের মধ্যে বহুর সমাবেশ বা বহুর মধ্যে একের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

উপাসনার উপায়

উপাসনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এ উপায়গুলোর মধ্যে আছে পূজা করা, জপ ধ্যান বা যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা প্রভৃতি। এ ছাড়াও দেব-দেবীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ, প্রার্থনা মন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রণাম মন্ত্র পাঠ, আরতিগান, কীর্তন প্রভৃতি উপাসনার উপায় হিসেবে ধরা হয়। এ বাহ্য আচরণের মাধ্যমে মূলত অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রকাশ করা হয়। উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনেক মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে। সেগুলো আবৃত্তি করে উপাসনা করা হয় বা প্রার্থনা জানানো হয়।

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

১. **হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা :** ঈশ্বরের উপাসনা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে।

২. **মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা :** উপাসনা মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে, মনের আবেগকে পরিশুদ্ধ, উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **ভক্তদের মনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সৃষ্টি করা :** উপাসনা ভক্তদের ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে গভীর চেতনার সৃষ্টি করে।

৪. **মানসিক অবস্থার উন্নতি করা :** উপাসনা মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে, মনের কুটিলতা দূর করে এবং মনকে শুদ্ধ করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। উপাসনা মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, আমিত্ব, হিংসা বিদ্বেষ দূর করে।

৫. **ভক্ত ও ঈশ্বরকে মুখোমুখি করা :** উপাসনার মাধ্যমে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে সে তাকে নিজের চোখে অবলোকন করতে পারে।

৬. **মোক্ষ লাভ :** মোক্ষ অর্থ চিরমুক্তি। দেহান্তরের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। কিন্তু পুণ্যবলে একসময় আর দেহান্তর হয় না। তখন জীবাত্মাকে আর অন্যদেহে যেতে হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। একে বলে মোক্ষ, মোক্ষলাভ। উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ, শেষে মোক্ষলাভ।

পাঠ ৬ : ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

উপাসনার একটি মন্ত্র :

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩/৯)

সরলার্থ : যা থেকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছু নেই, যা থেকে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বমহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষের দ্বারাই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।

উপাসনার শিক্ষা : এ শ্লোক থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হলো–
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজ গুণে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ বিশ্বজগতে বিরাজ করছেন। তিনি ছাড়া এ জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আমাদের উচিত সবসময় ঈশ্বরের নাম জপ করা বা প্রতিদিন একবার ঈশ্বরের মন্ত্র বা শ্লোক পাঠ করা, যাতে আমাদের মনে ঈশ্বরের মহত্ত্ব সর্বদাই পরিব্যাপ্ত থাকে।

প্রার্থনা মন্ত্র

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥

সরলার্থ : হে কেশব, হে দুঃখ দূরকারী, হে নারায়ণ, হে জনার্দন, হে গোবিন্দ-পরমানন্দ, হে মাধব আমাকে উদ্ধার করো।

শিক্ষা

ভগবান বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জীব ও জগতের মঙ্গলের জন্য অনেক লীলা করেছেন। দুষ্টের দমন করে ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, শান্তি স্থাপন করেছেন। তাঁর অনেক নাম : কেশব, নারায়ণ, জনার্দন, গোবিন্দ, মাধব ইত্যাদি। তিনি সবসময় আনন্দময় থাকেন, সুখ বা দুঃখে তিনি বিচলিত হন না। তাই তিনি পরমানন্দ। তিনি জীব ও জগতের দুঃখ হরণ করেন, অর্থাৎ দূর করেন। আমরা জীবেরা অনেক সময় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমন কাজ করি, যাতে পাপ হয়। তাই আমাদের পাপ ক্ষমা করে উদ্ধার করার জন্য আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। এ প্রার্থনা মন্ত্র থেকে আরও শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের কাছে পাপমুক্তির জন্যও প্রার্থনা করতে হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কলিযুগের অন্তে অবতার হিসেবে কার আবির্ভাব ঘটবে?

ক. কূর্ম খ. বরাহ
গ. বামন ঘ. কল্কি

২। ঈশ্বরের সাকার রূপ কারা?

ক. মুনি-ঋষি খ. দেব-দেবী
গ. যোগী-সন্ন্যাসী ঘ. সাধক-সাধিকা

৩। রোগ প্রতিরোধকারী দেবী কে?

ক. লক্ষ্মী খ. দুর্গা
গ. কালী ঘ. শীতলা

৪। পরমাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ পরমাত্মা–

i. সাকার
ii. মৃত্যুহীন
iii. জন্ম ও মৃত্যুহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমিতা দেবী ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ।

৫। সুমিতা দেবী কোন ধরনের উপাসনা করেন?

ক. সাকার খ. নিরাকার
গ. সকাম ঘ. সমবেত

৬। নিয়মিত উপাসনার ফলে সুমিতা দেবীর–

i. হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে ii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে
iii. ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশা পূরণ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

শুভ্র ও তার মায়ের কথোপকথন–

শুভ্র - মা, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হয় কেন? দাদু মারা গেলেন কেন?
মা - এটি মহাবিশ্বের একটি নিয়ম। এর মূলে রয়েছেন স্রষ্টা। তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি।
শুভ্র - মা, ঈশ্বর কে? ব্রহ্মা, শিব না বিষ্ণু?
মা - এঁরা সকলেই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি এবং ঈশ্বরের সাকাররূপের প্রতিফলন। তাই আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি।

ক. বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কোনটি?
খ. উপাসনা বলতে কী বোঝায়?
গ. অনুচ্ছেদে শুভ্রের প্রশ্নের জবাবে তার মা স্রষ্টার কোন ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শুভ্রের মায়ের শেষোক্ত কথাটি–'ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রতিফলন'–বিশ্লেষণ করো।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সেবা

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা স্রষ্টার স্বরূপ ও উপাসনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এ পরিচ্ছেদে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সেবা সম্পর্কে জানব। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, তিনি নিরাকার। তিনিই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান, এ সম্পর্কে একটি শ্লোক ও কবিতা এবং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- আত্মারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে জীব ও জগতের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি গীতিকবিতা ব্যাখ্যা ও এর শিক্ষা শনাক্ত করতে পারব
- ঈশ্বরজ্ঞানে জীব সেবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- জীব ও প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে এবং জীবসেবা ও পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর

সুনীল আকাশ, পৃথিবী ও পৃথিবীর প্রকৃতি–সব মিলিয়ে বিচিত্র এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অনন্ত আকাশজুড়ে বিরাজ করছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী। পৃথিবীতে রয়েছে সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, আলো-বাতাস ও বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু। সবকিছু মিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অন্ধকার। তারপর এল আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এলো গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, মানবকুল প্রভৃতি। এ সবকিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। গীতায় বলা হয়েছে, তিনি পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়। এ বিশ্বে জীবকুল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। আবার তিনিই জীবদেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী জীবাত্মা হিসেবে বিরাজ করছেন। তিনি জীবের জীবন, প্রাণীর প্রাণ, সর্বভূতের সনাতন বীজ। জীবদেহের ভেতরে যে জীবন আছে তা পরমাত্মারই অংশ। আত্মা ছাড়া জীবদেহ অচল, মৃত। তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। কথাটি আরও একটু বুঝিয়ে বলি : জীবদেহের মধ্যে

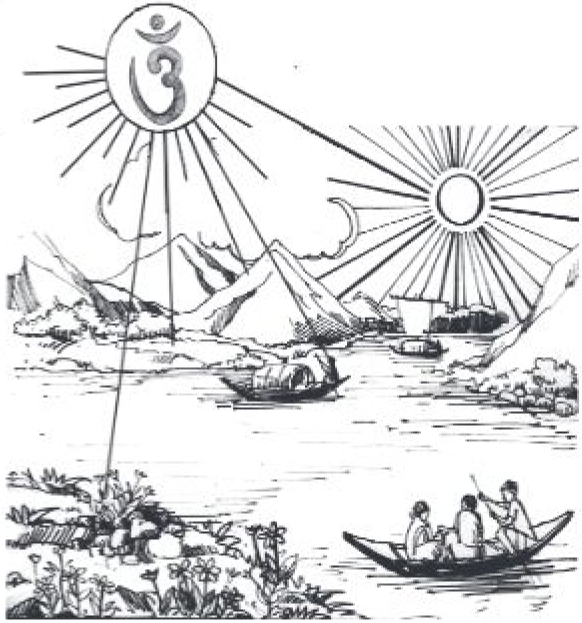

যখন ঈশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করেন, জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়, সচল, সক্রিয় হয়। যতদিন জীবাত্মারূপে তিনি জীবদেহে অবস্থান করেন, ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু থাকে। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের বিনাশ ঘটে। তাই বলা হয়েছে ঈশ্বরই আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তিনিই আমাদের চিন্তা, চেতনা ও সকল প্রচেষ্টার নিয়ন্তা।

ঈশ্বর মানুষ ও জীবজন্তুর কল্যাণে অফুরন্ত সৌন্দর্যে ও সম্পদে ভরপুর এ সুন্দর পৃথিবী ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রকৃতিতে বিরাজ করছে কত রকমের ফুল, কত রকমের ফল। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁরই সৌন্দর্য। সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলেও ঈশ্বর রয়েছেন।

পাঠ ২ : আত্মারূপে ঈশ্বর

স্রষ্টা বা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান নামে পরিচিত। পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সকল গুণই জীবাত্মার

মধ্যে বিদ্যমান। তাই পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও জন্ম-মৃত্যুহীন এবং শাশ্বত। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ কোনোটিই সম্ভব নয়।

ইনি নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ ঘটলেও ইনি বিনষ্ট হন না (গীতা, ২/২০)। আত্মার দেহান্তর ঘটে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে–

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী'॥ *(২/২২)*

অর্থাৎ মানুষ পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে যেমন নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। আত্মার এই দেহ পরিবর্তনকে জন্ম ও মৃত্যু বলে।

দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা আবার আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব। দেহহীন আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মাহীন দেহ জড়। অর্থাৎ জড় বস্তুর আত্মা নেই, তাই নিশ্চল, প্রাণহীন ও ক্রিয়াহীন। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও জানা যায়– আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চিরনতুন।

পাঠ ৩ : জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রজনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে :

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভুতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ *(১০/২০)*

সরলার্থ : হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা, আমি ভূতসকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

শিক্ষা : এখানে আদি বলতে জীব-জগতের উৎপত্তি, মধ্য বলতে তাদের স্থিতি এবং অন্ত বলতে তাদের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। এ কথা উপলব্ধি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসব ও সেবা করব। উল্লিখিত শ্লোকের আলোকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি–

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে

ভূধর সলিল গহনে,

আছ বিটপী লতায় জলদের গায়

শশী তারকায় তপনে।

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত কবিতাংশটি রজনীকান্ত সেন-এর একটি গীতিকবিতার অংশ। এখানে সবকিছুর মুলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থান করেন। কবি রজনীকান্ত সেন-এর এ গীতিকবিতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর অনল অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও চির

সুনীল আকাশে আছেন। এর অর্থ হচ্ছে–অগ্নির যে দাহিকা শক্তি, তা ঈশ্বরের শক্তি। বায়ু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। বায়ুর যে গতি, তার মূলে রয়েছে ঈশ্বরের শক্তি। আমাদের মাথার ওপরে যে সুনীল আকাশ, ঈশ্বর সেখানেও আছেন নীলিম সৌন্দর্যরূপে। একইভাবে ভূধরে মানে পর্বতের দৃঢ়তা, উচ্চতা ও মৌনতার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বর আছেন জলের গভীরতায়। তিনি বৃক্ষ, লতা, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যেও বিরাজিত আছেন। এ সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছেন। রজনীকান্ত সেন এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন যে, ঈশ্বর সকল কিছুর মূলে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিজের মহিমা ও সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বরের সৌন্দর্যেই সকল কিছু সুন্দর। তাঁর শক্তিতেই সকল কিছু শক্তিমান।

পাঠ ৪ : ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা

সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন– অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

হিন্দুধর্মে বৃক্ষ একটি জীব। বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত। তাই বৃক্ষের সেবা বা পরিচর্যা করার

বিষয়টিকে হিন্দুধর্মে প্রাচীন কাল থেকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আহারের শেষে কিছু অংশ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এই অংশ জীবকে দেওয়া হয়। এভাবেও জীবসেবা হয়।

হিন্দুধর্মে জীবসেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সেবাশ্রম, মঠ গড়ে উঠেছে যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। বিভিন্ন উপায়ে জীবসেবা করা হচ্ছে।

সকল জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত এবং ঈশ্বরের সত্তা প্রকাশিত। আমরা এ সত্য উপলব্ধি করে, সব ভেদাভেদ ভুলে জীবের সেবা করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'আত্মা জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হলেও চির নতুন'-কে বলেছেন?

ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীবিজয়কৃষ্ণ
গ. শ্রীকৃষ্ণ ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণ

২। ভক্তদের কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত?

ক. ব্রহ্ম খ. বৈষ্ণব
গ. ভগবান ঘ. পরমাত্মা

৩। জীবকে ভালোবাসার মূল কারণ হচ্ছে—

i. যেখানেই জীব সেখানেই শিব ii. ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন
iii. জাগতিক কল্যাণ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অতীন্দ্র বাবু প্রতিদিন দুপুরে আহারের সময় একমুঠো ভাত তাঁর একটি কুকুরকে দিতেন। একসময় কুকুরটি তাঁর খুব ভক্ত হয়ে ওঠে।

৪। অতীন্দ্র বাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের কোন মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. পশুপ্রীতি খ. জীবসেবা
গ. কর্তব্যনিষ্ঠা ঘ. অন্নদান

৫। অতীন্দ্র বাবুর পক্ষে ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্ভব, কারণ তাঁর বিশ্বাসে রয়েছে ঈশ্বর–

i. সকল সৃষ্টির মূল ii. মহাবিশ্বের নিয়ন্তা

iii. আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মৌমিতার বোনের জন্মের সাত দিন পরেই তার ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। প্রিয় ঠাকুরমাকে হারিয়ে সে একা হয়ে পড়ে এবং মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে মা তাকে জীবাত্মা সম্পর্কে একটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। মৌমিতা তা উপলব্ধি করতে পেরে শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত করে।

ক. ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে?

খ. ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয়?

গ. অনুচ্ছেদে মৌমিতার মা কোন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মৌমিতার উপলব্ধিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে হিন্দুধর্ম। বিশ্বাসসমূহের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস হচ্ছে মৌল বিশ্বাস। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজিত, তিনি এক, অভিন্ন, অনন্য পরমসত্তা। তিনি নিরাকার, তবে প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। যেমন– ঈশ্বরের অবতারগণ।

এঁদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পুজা-অর্চনার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমরা জানি ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তিকে ঈশ্বর যখন আকার দেন, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। তবে দেব-দেবী ও অবতারগণ সবাই এক পরমেশ্বরের বিভূতি এবং শক্তির প্রকাশক। দেব-দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে ভক্ত ঈশ্বরের করুণা পেয়ে থাকে। কেননা, ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ হিসেবে দেব-দেবীর আবির্ভাব। আর অবতাররূপে তো স্বয়ং ভগবানই পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাই বিভিন্ন অবতার ও দেব-দেবী একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সাকার রূপ।

হিন্দুধর্মে জীবনকে সার্থক ও গৌরবময় করার জন্য ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম বা চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ–এর যেকোনো একটি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করলেই মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সাধন জীবনের এই স্তরগুলো জেনে অনুশীলন করে জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারেন।

এ পরিচ্ছেদে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস মতে, একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, চতুরাশ্রম, যোগ এবং কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের ধারণার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে একেশ্বরবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অবতারবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বিভিন্ন অবতার, দেব-দেবী প্রভৃতি একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রকাশ বা সাকার রূপ অর্থাৎ হিন্দুধর্ম মূলত যে একেশ্বরবাদী–এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- চতুরাশ্রমের ধারণা (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ব্যাখ্যা করতে পারব
- যোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মবোধে জাগ্রত হব এবং ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : একেশ্বরবাদ

হিন্দুধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচার পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেখানে যেমন রয়েছে একেশ্বরের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন অবতার এবং বহু দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা-অর্চনার কথা।

এভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কি বহু ঈশ্বরবাদী? এ প্রশ্নের উত্তর হিন্দুধর্মগ্রন্থেই রয়েছে।

বেদ ও উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একাধিক নন। এই যে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, একেই বলে একেশ্বরবাদ। প্রচলিত বহু দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। তবে দেব-দেবীগণ ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণের অধিকারী।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, উষা প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তুতি রয়েছে। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় বহন করলেও এঁদের সম্মিলিত শক্তির কেন্দ্রটি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঋগ্‌বেদে এ সম্পর্কে ঋষিদের উপলব্ধি হচ্ছে : 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

অর্থাৎ সদ্‌বস্তু এক, বিপ্রগণ তাঁকে বহুপ্রকার বলে বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে, কঠোপনিষদে দেখা যায় 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'(কঠ ২/১/১১) ব্রহ্ম থেকে পৃথক কিছু নেই। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। বিশ্বে ঈশ্বরের সমান আর কেউ নেই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও একেশ্বরের কথা বলা হয়েছে। 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'- (গীতা-৯/১৮)। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে – তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, তাঁর দ্বারা স্থিতি এবং তাঁতেই হচ্ছে লয়। তিনিই জগতের নিধান–আধার ও আশ্রয়।

সুতরাং অবতার ও দেব-দেবীগণ এক পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ। এ কারণে উল্লেখ্য, দেব- দেবীর আরাধনা করে মানুষ যে সাফল্য অর্জন করে তাতে এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বহুমুখী সাধনার মধ্যেও দেব-দেবীর আরাধনা ও ব্রহ্ম সাধনার মধ্যে এক সমন্বয় চেতনা রয়েছে। সাকার দেবী কালীও যিনি, নিরাকার এক ব্রহ্মও তিনি। যিনি কালী, তিনি ব্রহ্ম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলিত হলেও মুলত এক পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা হচ্ছে। সুতরাং অবতার ও দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়–এ বিশ্বাসকে বলা হয় একেশ্বরবাদ। এভাবে একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এবং হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একেশ্বরবাদী বলা যায়।

পাঠ ২ ও ৩ : অবতারবাদ

হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অবতারবাদে বিশ্বাস। অবতার-এর অর্থ হচ্ছে উপর থেকে নিচে নামা বা অবতরণ করা। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য ধর্ম অনুশীলনের ব্যবস্থা রেখেছেন। ধর্মের অসাধারণ গুণ। ধর্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম তাকে রক্ষা করে 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'।

তবে মনুষ্যসমাজে মাঝে মাঝে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা দেখা দেয়। ধার্মিকদের জীবনে নেমে আসে নিপীড়ন-নির্যাতন। দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচার-অনাচার সমাজজীবনকে কলুষিত করে তোলে। এরূপ অবস্থায় ভগবান স্বয়ং জীব মূর্তি ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন। একেই বলা হয় অবতার। আর অবতার সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা, তা অবতারবাদ নামে পরিচিত।

অবতারের উদ্দেশ্য দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন, সাধু-সজ্জনদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব এবং ধর্ম সংস্থাপন করা। এই অবতারবাদের সূচনা লক্ষ করা যায় পৌরাণিক যুগে। অনন্ত শক্তিধর ঈশ্বর জীবের ন্যায় দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হন। এই আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে অবশ্য অসীম ঈশ্বরের ধারণায় কোনো ছেদ ঘটে না।

ঈশ্বর হচ্ছেন চৈতন্যময় সত্তা। তিনি চৈতন্যস্বরূপ। তিনি অসীম সসীম সকল অবস্থাতেই থাকতে পারেন। কাজেই অবতার সসীম হয়ে দেহ ধারণ করে এলেও তার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি থাকে। জীব দেহ ধারণ করলেও তিনি এবং জগৎ কারণ ব্রহ্ম এক এবং তাঁর এই স্থূল দেহ ধারণ একটি মায়ার খেলা মাত্র।

এই অবতার তিন পর্যায়ের হয়ে থাকে। যথা– গুণাবতার, লীলাবতার ও আবেশাবতার। পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারূপে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। এরা পরমেশ্বরের গুণাবতার। আবার পৃথিবীতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি স্থূল দেহধারী জীবের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা যে কর্মকাণ্ড করেন তাকে লীলাবতার বলা হয়। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। এ মহাপুরুষেরা আবেশাবতার। বিষ্ণুর দশাবতারের কথা বলা হয়েছে। এঁরা হলেন– মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম (শ্রীরামচন্দ্র), বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি।

পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায়, বেদ প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্ন হলে ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করে বেদ উদ্ধার করেন। এরপর পৃথিবী জলপ্লাবিত হলে কূর্মরূপে ভগবান পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। এটি কূর্মাবতার। পুনরায় পৃথিবী জলপ্লাবিত হলে ভগবান বরাহরূপে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করেন।

নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অত্যাচারী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং রক্ষা করেন ভক্ত প্রহ্লাদকে। ভগবান বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে রাজা বলির দর্প চূর্ণ করেন। ক্ষত্রিয় প্রতাপে পৃথিবী নিপীড়িত হলে তিনি পরশুরামরূপে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়হীন করেন। অত্যাচারী রাজা রাবণের বিনাশ সাধন করেন শ্রীরামচন্দ্র অবতার। হলধর বলরাম হল কর্ষণ করে পৃথিবীকে অমৃতময় করেন। একইসঙ্গে তিনি অন্যায়কেও দমন করেন। বুদ্ধরূপে তিনি অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার নৈতিক শিক্ষায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসী হন। কলিযুগের শেষ ভাগে যখন অধর্ম ও অসত্যের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠবে তখন বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ধর্ম ও সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। অবতারের সংখ্যা অবশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, অবতার অসংখ্য। এখানে প্রধানত দশ অবতারের কথা বলা হয়েছে।

দশ অবতারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি স্বয়ং ভগবান। তাই তাঁকে বলা হয় মহা-অবতারী। দশ অবতারের মধ্য দিয়ে তাঁরই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে কৃষ্ণপ্রশস্তিতে বলা হয়েছে—

"বেদকে তুমি করেছ উদ্ধার,
বহন করেছ পৃথিবীর ভার,
দশন শিখরে ধারণ করেছ মেদিনী,
দৈত্যের অত্যাচার থেকে করেছ তাকে মুক্ত,
চূর্ণ করেছ ছলে বলির দর্প,
মুক্ত করেছ ধরণীকে ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার থেকে,
জয় করেছ দুর্জয় দশাননকে,
শ্যামল করেছ মেদিনীকে হল কর্ষণ করে,
মুক্ত অন্তরে বিলিয়েছ করুণা,
তুমিই আবার আসবে ম্লেচ্ছ নিধনকল্পে,
দশমূর্তিধারী হে কৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম।"

সুতরাং মৎস্য, কূর্ম, বামন প্রভৃতি ভগবানের অংশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ মানুষের ধারণার অতীত। তবে অবতার পুরুষের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজিত। অবতাররূপে দেহ ধারণ করে অসীম, অনন্ত সসীমরূপ ধারণ করে থাকেন। তাই হিন্দুদের নিকট অবতার স্বয়ং ভগবানেরই এক মুক্ত প্রকাশ। আর এ জন্যই হিন্দুরা অবতারকে ভগবৎ-শক্তির আশ্রয় হিসেবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অবতার ও দেব-দেবী একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রকাশ বা সাকার রূপ। এ অর্থে হিন্দুধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী।

পাঠ ৪ ও ৫ : চতুরাশ্রম

হিন্দুধর্মের দুইটি দিক প্রত্যক্ষ করা যায় : ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য থাকে। ধর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও নিশ্চিত মঙ্গল লাভ হয় তার নাম ধর্ম। এ থেকে বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের ঋষিগণ মানবজীবনকে বিকশিত ও সার্থক করে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

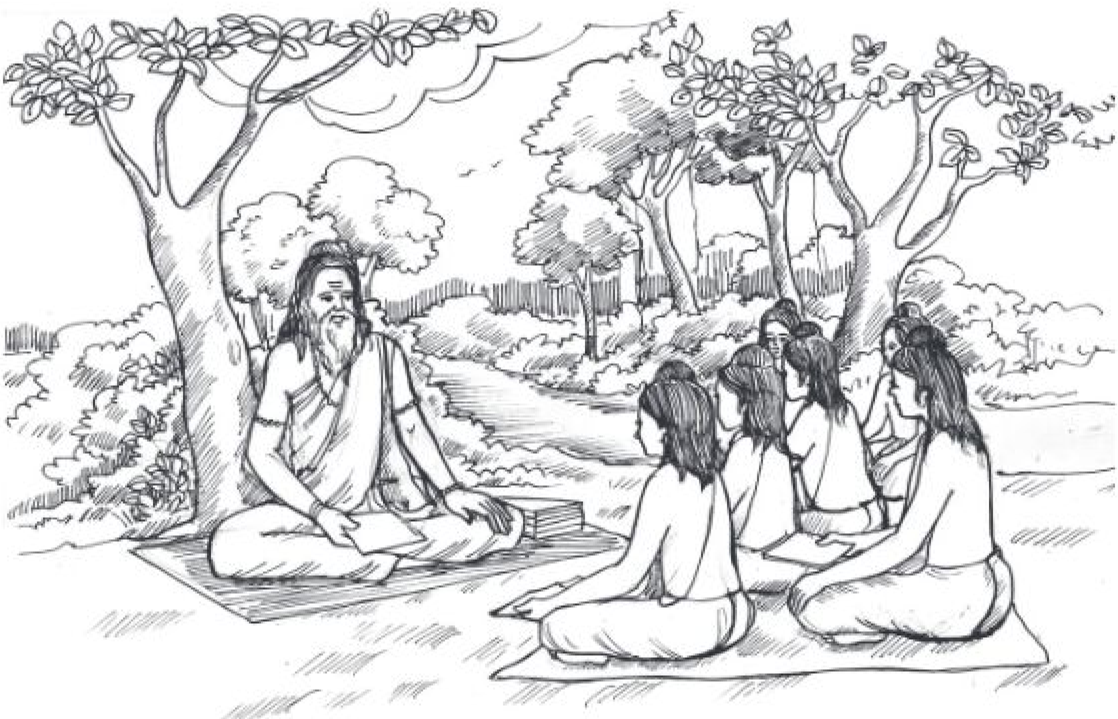

স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবিত থাকার সময় ধরা হয় একশত বৎসর। এই শতবর্ষের জীবনকে চারটি স্তরে বা আশ্রমে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি বিভাগের সময়সীমার গড় পঁচিশ বছর। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। দ্বিতীয় পঁচিশ বছর গার্হস্থ্য আশ্রম। তৃতীয় পঁচিশ বছর বানপ্রস্থ আশ্রম এবং শেষ পঁচিশ বছরকে সন্ন্যাস আশ্রম বলা হয়।

১. ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রতিটি আশ্রমেই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম রয়েছে। মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে গুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমে থেকে শিষ্যকে গুরুর নির্দেশে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হয়।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে।

২. গার্হস্থ্য আশ্রম

বিবাহের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণ-পোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ কর্মের অনুশীলন করতে হবে। এই পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে : পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতা-পিতার মাধ্যমে। মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা যত্ন সন্তানের প্রধান কর্তব্য আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করার মাধ্যমে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে।

মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়। এই দানের কর্তা বা উৎস হলেন স্বয়ং ভগবান। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশিত। তাই প্রকৃতিদত্ত বস্তু ভোগ করার সময় মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকৃতি ভগবানকে তার ভোগ্যবস্তু নিবেদন করে থাকে। এই কর্মটিকে বলা হয় দৈবযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ হচ্ছে পাখিসহ অন্যান্য জীবজন্তুর আহার প্রদানসহ নানা প্রকার পরিচর্যা। অতিথি সেবাকে বলা হয় নৃযজ্ঞ। পদ্ধতিগতভাবে বেদসহ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাঠের দ্বারা জ্ঞান ও নৈতিকতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে বলা হয় ঋষিযজ্ঞ। প্রাচীনকালে মুনিঋষিদের নিকট থেকে উক্ত জ্ঞান অর্জন করতে হতো বলে এ যজ্ঞের নাম ঋষিযজ্ঞ।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেবাধর্ম অনুশীলন করে। এ সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

৩. বানপ্রস্থ আশ্রম

তৃতীয় পর্যায়ে আসে **বানপ্রস্থ** আশ্রমের কথা। সেখানে মানুষ সংসারের দায়-দায়িত্ব সন্তানের উপর ন্যস্ত করে নির্জন পরিবেশে অবসর জীবনযাপন করে। এখানে সংসার জীবনের সঙ্গী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারেন তবে তাঁদের জীবন চর্চায় সংযম, ত্যাগ, নির্লোভ আচরণের বিধান থাকে। বানপ্রস্থে বনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ বনবাসী না হয়ে গৃহ ত্যাগ করে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সেবা বা পূজা-অর্চনার মাধ্যমে বৈরাগ্যময় জীবনযাপন করতে পারে। এ পর্যায়ে ভজন, পূজন, কীর্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মীয় কর্মে মগ্ন থেকে বানপ্রস্থের জীবনন্তর কাটানো যায়।

৪. সন্ন্যাস

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে এক'শ বছরের মধ্যে জীবন ধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দু'বেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ'। অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে–

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ *(৬/১)*

অর্থাৎ, কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহাদি কর্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

শাস্ত্রীয় যুগবিভাগ অনুসারে বর্তমান যুগ কলিযুগ। এ সময়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এ চার আশ্রমের অনুশীলন সম্ভব নয়। বর্তমানে ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম নেই বললেই চলে। ব্রহ্মচর্য বর্তমানে ছাত্রজীবনে পর্যবসিত হয়েছে। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এ দুটি আশ্রম লক্ষ করা যায়। তবে গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা এদের পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণে উৎসাহিত করা হয় না। তাই কলিযুগে গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে জীবনযাপন করাই ভালো। এতেই মানুষের জীবন সার্থক হয় এবং কল্যাণময় হয়।

পাঠ ৬ ও ৭ : যোগের ধারণা

যোগসাধনা মুক্তিলাভের একটি বিশেষ উপায়। 'যোগ' শব্দটি সাধারণভাবে সংযোগ অর্থই ব্যক্ত করে। একের সঙ্গে অপরের সংযোগকে সংক্ষেপে যোগ বলা হয়। কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে এই যোগের অর্থ আরও গভীরে নিহিত। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধনা। যোগশাস্ত্রে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এবং

পতঞ্জলির যোগ দর্শনে বলা হয়েছে–'যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা হয়। মোক্ষ লাভের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি। আর এই আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ, স্থির ও প্রশান্ত মন বা চিত্তের স্থিরতা।

মনকে শুদ্ধ ও শান্ত করার জন্য যোগদর্শনে আট প্রকার সাধনপ্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে; যেমন- ১. যম ২. নিয়ম ৩. আসন ৪. প্রাণায়াম ৫. প্রত্যাহার ৬. ধারণা ৭. ধ্যান ও ৮. সমাধি। এই আট প্রকার যোগাঙ্গ অনুশীলন করে একজন যোগী মুক্তিলাভ করতে পারেন। যোগাঙ্গগুলোর পরিচয় নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. যম : 'যম' শব্দটি মূলত সংযম অর্থ প্রকাশক। মুক্তিলাভের জন্য সাধক দৈনন্দিন জীবনে আচার-আচরণে সংযমী হবেন। তাকে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ–এ পাঁচটি বিষয়ের অনুশীলন করতে হবে। এই পাঁচটিকে বলা হয় যম। দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা কোনো জীবকে হত্যা না করা বা নির্যাতন না করাকে বলে অহিংসা। যোগী পুরুষ বাক্যে কর্মে সত্যনিষ্ঠ হবেন। কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। আবার অস্তেয় বলতে বোঝায় অপরের জিনিস চুরি না করা। মনে যেন চুরি করার ইচ্ছাও না জাগে। সে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না, একে বলা হয় অপরিগ্রহ।

২. নিয়ম : শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি অনুষ্ঠান নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। শৌচ দুই প্রকারের : বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। স্নানাদির মাধ্যমে দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাহ্যিক শৌচ লাভ হয়। আবার সৎ চিন্তা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি ভাবনার দ্বারা অভ্যন্তরীণ শৌচ লাভ হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকাই সন্তোষ। আবার শ্রদ্ধার সাথে শাস্ত্র নির্ধারিত ব্রত উদ্‌যাপন করাকে বলে তপস্যা। বেদাদি ধর্মশাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করাই স্বাধ্যায়। ঈশ্বরকে সর্বক্ষণ চিন্তা করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

৩. আসন : দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থানকে বলে আসন। যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসন রয়েছে অনেক প্রকারের, যেমন– পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি। এই আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগীপুরুষ নিজ দেহ ও মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করে। তবে কোনো গুরু বা যোগীর নিকট এই আসন প্রক্রিয়া শিক্ষা করা দরকার। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অবৈজ্ঞানিকভাবে আসন অভ্যাসে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. প্রাণায়াম : শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন– রেচক, পূরক এবং কুম্ভক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে ধরে রাখার নাম কুম্ভক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

৫. প্রত্যাহার : দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করা কষ্টসাধ্য বটে কিন্তু অসাধ্য নয়। দৃঢ়সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয়-আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে।

৬. ধারণা : অদ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তুতে মনকে ধারণ বা স্থাপিত করার নাম ধারণা। সমস্ত বাহ্যবস্তু পরিহার করে মনকে ব্রহ্মবস্তুতে স্থাপন করতে হবে। এর দ্বারা যোগীর চিত্ত সুস্মিত হয়।

৭. ধ্যান : ধারণা ও ধ্যান দুইটি গভীর সম্পর্ক যুক্ত। ধারণার দ্বারা মনকে লক্ষ্যবস্তুতে স্থির রাখা যায়। ধারণার সে স্থির অবস্থাটি ধ্যানে আরো নিবিড় হয়। যে বিষয়ে মনকে স্থির রাখা হয়েছে সে বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে। অবিচ্ছিন্ন ধারণাই ধ্যান। পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য ধ্যান অত্যন্ত আবশ্যক।

৮. সমাধি : যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি। ধারণা মনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয়, আর ধ্যানে সে সুযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। সমাধিতে এসে যোগীর ধ্যানলব্ধ চিত্তে স্থিরতা আরো গভীর হয়। সমাধিতে যোগীর চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে সম্পূর্ণভাবে লীন হয়ে যায়। সে সময় যোগীর চিত্তটি স্থির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উন্নীত হয়। তখন ধ্যান-কর্তা, ধ্যানের বিষয় এবং ধ্যান প্রক্রিয়া এই তিনটি মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে যায়। এই একাকার অবস্থায় ধ্যানীর নিজস্ব কোনো অনুভূতি থাকে না; আরাধ্য বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এটাই সমাধির চরম অবস্থা।

উক্ত অষ্টাঙ্গযোগের স্তরগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়– বহিরঙ্গ সাধন এবং অন্তরঙ্গ সাধন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার এই পাঁচটিকে বলা হয় যোগ সাধনার বহিরঙ্গ সাধন; ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে বলা হয় অন্তরঙ্গ সাধন। যোগসাধনার মাধ্যমে যোগী মুক্তি লাভ করে থাকেন।

পাঠ ৮ ও ৯ : কর্মযোগ

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ঈশ্বর বা মোক্ষলাভ। ঋষিগণ এই মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে তিনটি সাধন পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এই সাধন পদ্ধতিগুলোর যে কোনো একটি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে একজন সাধক মোক্ষলাভ করতে পারেন।

যা কিছু করা হয় তাকেই বলে কর্ম। আমরা প্রতিনিয়ত জীবনধারণের জন্য যে কাজ করি তার সকলই কর্ম। কর্ম দু'রকম–সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যখন বিশেষ কোনো ফলের আশায় কর্ম করা হয় তখন

তাকে বলে সকাম কর্ম। অর্থাৎ, কামনা বাসনা যুক্ত কর্ম। এই কর্মে কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অভিমান থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে; এমন বোধ হয় আমি কর্ম করছি, আমি কর্মের কর্তা, কর্মের ফলও আমিই ভোগ করব। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম ভিন্ন রকম। এখানে কর্তা কর্ম করেন কোনো রকম ফলের আশা না নিয়ে। তিনি মনে করেন কর্মের কর্তা আমি নই, কর্মফলও আমার নয়। নিষ্কাম কর্মের ফল কর্মকর্তাকে স্পর্শ করে না। এই নিষ্কাম কর্মই যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ। সকাম কর্মে বন্ধন হয়; আর নিষ্কাম কর্মে মোক্ষলাভ হয়। কর্মকে যোগে পরিণত করে তা অনুশীলন করলে অভীষ্ট মোক্ষলাভ সম্ভব।

বৈদিক যুগে সকাম কর্মের সর্বোচ্চ ফলপ্রাপ্তি হিসেবে স্বর্গ লাভের কথা জানা যায়। পুণ্যফল ভোগের শেষে স্বর্গ থেকে চলে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা)- পুণ্য ক্ষয় হলে মানুষ পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এ অবস্থায় মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না। তাই উপনিষদের ঋষিগণ কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন। তাঁদের বক্তব্য – কর্ম করলেই কর্মফল উৎপন্ন হবে। ঐ কর্মফল ভোগের জন্য কর্মকর্তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হতে হয়। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ আবশ্যক। এটা হচ্ছে সন্ন্যাসবাদীদের মতো।

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে উক্ত সন্ন্যাসবাদীদের মত খণ্ডন করে বললেন, মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্মকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। যাঁরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় জাগতিক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করেন, তাঁরাও কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্ম অনুশীলন করতে থাকেন। মুক্তিলাভের সোপান হিসেবে সংযম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন করেন; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন, আসন প্রভৃতি কর্ম তাদের চলতেই থাকে। তাহলে মুক্তিকামী সন্ন্যাসীগণও কর্মকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন না।

কর্মই জীবন। জীবনধারণের জন্য কর্ম করতেই হবে। তবে এই আবশ্যিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না। কর্মকে যোগে বা নিষ্কাম কর্মে পরিণত করতে হবে। মনে করতে হবে বিশ্ব জগৎ ঈশ্বরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে সর্বক্ষণ ঈশ্বরেরই কর্ম হচ্ছে। আর এই কর্ম করার জন্য ঈশ্বর জীবদের নিয়োগ করেছেন। তবে ফলের আশায় নয়। ঈশ্বরের নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে কর্ম করা। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত এই কর্মই কর্মযোগ। কর্মফলকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মাণি ॥' (২/৪৭)

অর্থাৎ, কর্মে তব অধিকার, ফলে কভু নয়। ফলাসক্তি ত্যাগ করো, কর্ম ত্যাজ্য নয়॥
কর্মযোগের নির্দেশ হচ্ছে–

কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়,
কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

১. কর্মকর্তাকে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। আমি কর্ম করছি, এরূপ অনুভূতি থাকবে না।
২. প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অবশ্যই নিষ্পন্ন করতে হবে।
৩. ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে।
৪. এরূপ কর্মে কর্মকর্তা অন্তরে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

৫. তখন ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং এভাবে কর্মানুশীলন করতে করতে ঈশ্বরানুগ্রহে মানুষের মুক্তিলাভ হয়ে থাকে ।

পাঠ ১০ ও ১১ : জ্ঞানযোগ

মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে জ্ঞানযোগ । জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি জ্ঞানযোগ । শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে । আর জ্ঞানের পথে

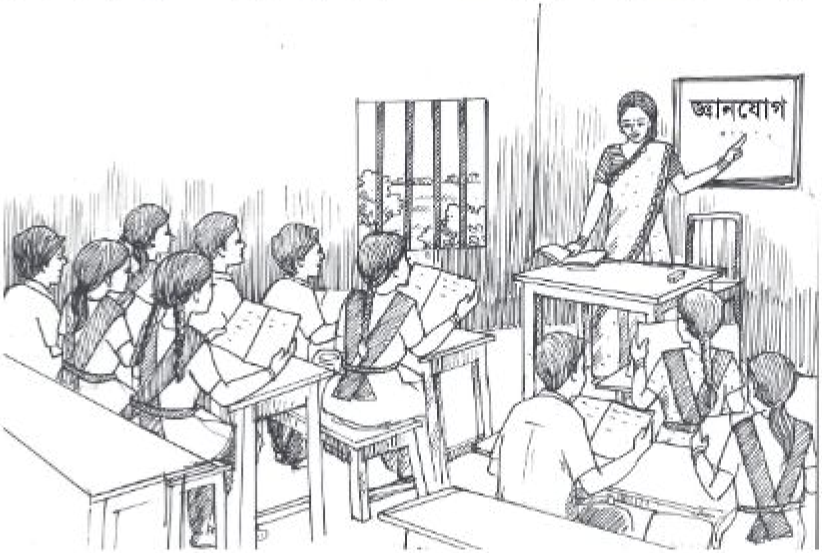

স্রষ্টাকে জানার যে সাধনা তাকে বলে জ্ঞানযোগ । জ্ঞানী জগৎ ও জীবের প্রকৃতি ও পরিণতি জেনে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্রষ্টাকে অন্তরে অনুভব করেন । তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা অবস্থান করছে । জগতের সবকিছু সেই পরম চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যময় । এই চৈতন্যই আত্মা বা জীবাত্মা ।

জ্ঞানী আরও উপলব্ধি করেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জীবাত্মা রয়েছে, তা বিশ্বআত্মা বা পরমাত্মা । জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরমাত্মার অবস্থান ধরা পড়ে বিশ্ব চরাচরের মধ্যে । তবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সেই পরমতত্ত্ব ধরা পড়ে না । কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা জীব আচ্ছন্ন থাকে । তার নিকট আত্মতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না । তবে ঈশ্বর-অনুগ্রহে যখন মায়ার প্রভাব কেটে যায় তখন জীব আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে । এভাবে তার সর্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে, বাসনা শুদ্ধ হয়, সুন্দর হয় তার আচরণ । তখন সাধকের অহংকার থাকে না, হিংসা থাকে না । গুরুসেবা, দেহ-মনে পবিত্র থাকা, জ্ঞানের বিষয়ে জানার আগ্রহ, ক্ষমা–এ সকল গুণ তার মধ্যে প্রকাশ পায় । শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর বিশটি লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে । জ্ঞানী কর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে থাকেন । তাই তার কর্ম হয় নিষ্কাম । শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি কথা রয়েছে–কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম । শাস্ত্রবিহিত যে সকল কর্ম করতে হয় সেগুলোকে বলে কর্ম । আর যা শাস্ত্র নিষিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে বিকর্ম । আর কোনো কাজ না করাকে বলা হয় অকর্ম । কর্মতত্ত্ব গহিন অরণ্যের মতো । সেখানে জ্ঞানী তাঁর

জ্ঞানালোকে কর্তব্যকর্ম নির্ণয় করে থাকেন। জ্ঞান অনুশীলনে মানুষের সমস্ত রকম দুঃখ, তাপ দূর হয়। ভক্ত মাত্রই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হলেও গীতায় জ্ঞানী ভক্তই ভগবানের বেশি প্রিয় (গীতা, ৭/১৭)। জ্ঞান অর্জনের জন্য গীতার নির্দেশ হচ্ছে তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম বন্দনা করতে হবে, সেবা কর্ম দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে হবে এবং বিনীতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করতে হবে। সেবাকর্মে তুষ্ট আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু তখন জ্ঞানপ্রার্থীকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ *(৪/৩৯)*

অর্থাৎ, যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে শীঘ্রই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

সংক্ষেপে জ্ঞানযোগের ফল হচ্ছে :

১. জ্ঞান পরম পবিত্র। সকল অপবিত্রতাকে দুর করে দেওয়ার ক্ষমতা জ্ঞানের রয়েছে।
২. জ্ঞানীর পাপ বিনষ্ট হয়। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা থাকতে পারে না।
৩. জ্ঞানীর কর্ম বন্ধন থাকে না। তাই জ্ঞানী পরম সুখে অবস্থান করেন। জ্ঞান লাভের জন্য আমরা সবাই যত্নশীল হব।

পাঠ ১২ ও ১৩ : ভক্তিযোগ

ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তিকে অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা ভক্তিযোগ। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি।

নারদীয় ভক্তি সূত্রে বলা হয়েছে–ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবকে ভক্তি বলে। শাণ্ডিল্য সূত্রে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–ভগবানের পদে যে একান্ত রতি, তারই নাম ভক্তি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। এর আগে কর্মজ্ঞানের কথা, ভগবানের বিভূতি ও বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সগুণ ঈশ্বর, নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে জেনেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছে–নির্গুণ, নির্বিশেষ, অরূপ ব্রহ্মের সাধনা আর ব্যক্ত ঈশ্বরকে সাকাররূপে আরাধনা করার মধ্যে কোনটি উত্তম পথ? উত্তরে ভগবান বলেছেন, সাধনার উভয় পথেই ক্লেশ আছে। তবে অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তার চেয়ে সগুণ মূর্তিমান সাকার ঈশ্বরের আরাধনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ঈশ্বরকে যাঁরা সাকারে গুণময়রূপে আরাধনা করেন তাঁরাই মূলত ভক্তি পথের সাধক। ভক্তিকে অবলম্বন করে যিনি সাধনা করেন তিনিই ভক্ত। ভক্ত সম্বন্ধে গীতায় বলা হয়েছে–যে ব্যক্তি আসক্তি, ভয় ও

ক্রোধ ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তিনি ভগবদ্‌ভাব লাভ করেন। তার পাপ তাপ দুঃখ বেদনা থাকে না। ভক্তির মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন। ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগের প্রধান কথা। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এ ভক্তির মূলে থাকবে গভীর বিশ্বাস–ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি করুণাময়, তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু।

গীতায় বহুবিধ সাধন পথের উল্লেখ রয়েছে। সে সকল পথে সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। তবে কর্মযোগের বা জ্ঞানযোগের যে পথেরই সাধক হোন না কেন, সকল পথেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥' *(৪/১১)*

–হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মানবগণ সকল প্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে। অর্থাৎ, মানবগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌঁছতে পারে।

ভক্তিযোগে ভক্তের চিত্তে ভগবানের অশেষ করুণা ও সর্বশক্তিমত্তায় থাকে গভীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অবলম্বন করে ভক্ত ভগবানকে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করেন। ভগবান একমাত্র গতি। এই অনুভূতি নিয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিমার্গের প্রধান ভাব। অর্থাৎ, ভগবানে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ ভক্তিযোগের সার কথা।

নতুন শব্দ– অষ্টাঙ্গযোগ, চতুরাশ্রম, একেশ্বরবাদ, অবতারতত্ত্ব, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগকে কী বলে?

ক. যোগশাস্ত্র খ. যোগসাধনা
গ. যোগদর্শন ঘ. যোগাঙ্গ

২। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কী?

ক. সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ খ. কর্ম পরিত্যাগ
গ. গৃহত্যাগ ঘ. ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

৩। গার্হস্থ্য কলিযুগের জন্য উত্তম আশ্রম, কারণ–

i. এর মধ্যে থেকে মানুষ সমাজের প্রতি তার কর্তব্য পালন করে।
ii. জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন।
iii. এতে মানুষের জীবন সার্থক ও কল্যাণময় হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোবিন্দ বাবু একজন সাধারণ গৃহস্থ। সংসারে সন্তান প্রতিপালন ও অর্থ উপার্জন সকল ক্ষেত্রেই তিনি ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করে কর্ম করার চেষ্টা করেন। এটাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু মাঝে মাঝে বৃদ্ধ বয়সে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার সন্তানরা নেবে কিনা এটা ভেবেও শঙ্কিত হন।

৪। ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণে গোবিন্দ বাবুর মূল লক্ষ্য ছিল কোনটি?

ক. জ্ঞান　　　　খ. ভক্তি

গ. মোক্ষ　　　　ঘ. কর্ম

৫। গোবিন্দ বাবুর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ কি?

ক. বিষয়প্রীতি　　　　খ. সন্তানপ্রীতি

গ. ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তা　　　　ঘ. ঈশ্বর সাধনায় মনোযোগহীনতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর বয়স ৭৫ বছর। তিনি সংসারে থেকেও অত্যন্ত সংযমী। তিনি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পুত্রের হাতে অর্পণ করে মন্দিরে মন্দিরে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এতেও তাঁর আত্মতৃপ্তি হয় না বিধায় তিনি জীবনের পরম প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

ক.　একেশ্বরবাদ কী?

খ.　প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়?

গ.　দ্বিজেন্দ্রনাথ সংসারে থেকে জীবনের কোন স্তরে অবস্থান করছেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ.　'জীবনের পরম প্রাপ্তি লাভে দ্বিজেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তটি ছিল যৌক্তিক।'–তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এর প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের প্রবর্তকরূপে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা যায় না। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মানবসভ্যতার কোনো বিস্মৃত অতীতে হয়তো কোনো আদিম মানবের মনে প্রথম ধর্মবোধ জেগে ওঠে। সেখান থেকে এ ধর্মের যাত্রা শুরু।

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে এ ধর্মের বিকাশ ও প্রসার লক্ষণীয়। বহিরাগত আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে প্রাগার্য ধর্মমতের সংশ্লেষণে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। হিন্দুধর্ম চিন্তায় একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি হিসেবে দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতির পরিচয় মেলে। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ, উপনিষদ (বেদান্ত), পুরাণ, গীতা, ভাগবতের প্রকাশ ঘটে এবং দার্শনিক চিন্তায়ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও সনাতন ধর্মের সংস্কার ও ধর্মসাধনার নব নব রূপ লক্ষণীয়। রাজা রামমোহন রায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভু জগদ্বন্ধু, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, বাবা লোকনাথ, হরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, এ.সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ ধর্মগুরুর গৌরবময় অবদান হিন্দুধর্মকে আধুনিকতার পরিমণ্ডলে উন্নীত করেছে। এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

এ অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার, সংস্কার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারব
- বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ধর্ম প্রচার, সংস্কার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সমুন্নত রাখতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে এই সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন। প্রাচীন এ কারণে যে, সনাতন ধর্ম তার সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আর নবীন এ কারণে যে, সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেও এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে। এ ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে কোনো একক ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিত করা যায় না। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ ধর্মমতের পরিচয় মেলে। দীর্ঘ যাত্রাপথে ধর্মের মূলতত্ত্বকে ধরে রেখেও নতুন নতুন ধর্মীয় চিন্তা গ্রহণ করে এ ধর্ম ক্রমশ পল্লবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নিদর্শন থেকে হিন্দুধর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় ও ধারণা পাওয়া যায়। আর্যরা এদেশের বহিরাগত সম্প্রদায়। তারা যখন ভারত ভূমিতে আসে তখন তাদের সঙ্গে ছিল নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি। এদেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আর্য সভ্যতার সংঘর্ষ এবং পরিণতিতে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে আর্য সভ্যতার একটা সমন্বয় ঘটে। এর ফলে হিন্দুধর্মের ধর্মচর্চার সঙ্গে আর্যদের ধর্মবিশ্বাস মিলিত হয়ে একটা নতুন রূপ ধারণ করে। কালক্রমে এটি আর্যসভ্যতা, আর্যধর্ম নামে প্রাধান্য লাভ করে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থিত সনাতন ধর্ম তার নতুন অভিধায় পরিচিত হওয়া শুরু করে। আর্যগণ সুপ্রাচীন সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। বহিরাগত আফগান ও পার্সিক সম্প্রদায় সিন্ধুনদকে হিন্দুনদ বলে উচ্চারণ করত। তাদের উচ্চারণে সিন্ধুর 'স' পরিবর্তিত হয়ে 'হ'-তে রূপ নেয় এবং সিন্ধু শব্দটি হিন্দু বলে উচ্চারিত হতে থাকে। তাই অনেক গবেষকের মতে, সিন্ধু শব্দ থেকেই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী লোকদের ধর্মই হিন্দুধর্ম বলে আখ্যায়িত হয়। সনাতন ধর্ম ক্রমে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে সময়ের অগ্রগতিতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের অনুষঙ্গী হিসেবে সনাতন ধর্মের চিন্তা-চেতনায় নতুনতত্ত্বের সংযোজন ঘটে। হিন্দুধর্মের এই বিকাশমান বৈশিষ্ট্যটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করে দেখা যায়– বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ ও আধুনিক যুগ।

বৈদিক যুগ

বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড, আবার আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ দুটি নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদের সংহিতা অংশে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি রয়েছে। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবগণের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট লাভের প্রার্থনা করা হতো। বেদ-মন্ত্রগুলো রহস্যময়। সাধারণের জ্ঞানে এর তাৎপর্য অনেক সময় ধরা পড়ে না। তবে যাগযজ্ঞের অনুশীলন করে আর্যগণ দুইটি বস্তুর প্রতি প্রার্থনা জানাতেন। বস্তু দুইটি হচ্ছে– শ্রী ও ধী।

শ্রী অর্থাৎ ধন-ধান্য, বল-বিক্রম, যশ ইত্যাদি পার্থিব কাম্যবস্তু। ধী হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আবার বেদের অন্য কতগুলো মন্ত্রের বিষয়বস্তু বুদ্ধি, জ্ঞানজ্যোতিঃ, অমৃততত্ত্ব। এ দুইটি চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বটি প্রকটিত হয়েছে। ধর্মের সংজ্ঞায় জানা যায় যা থেকে জাগতিক কল্যাণ এবং পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয় সেটিই ধর্ম। এটি সনাতন তথা হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। বৈদিক যুগের ঋষিদের ধর্মীয় চিন্তাচেতনায় জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক যুগে ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী, জীবনবাদী। বাজসনেয় সংহিতায় বলা হয়েছে–

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহ্যোঽসি সহ্যং ময়ি ধেহি।

অর্থাৎ তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও, আমাকে তেজস্বী কর। তুমি বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর। তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর। তুমি ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর। তুমি মন্যু স্বরূপ (অন্যায়দ্রোহী), আমায় অন্যায়দ্রোহী কর। তুমি সহ্যস্বরূপ (সহ্যশক্তি), আমায় সহনশীল কর।

বৈদিক যুগের প্রার্থনায় দেখা যায় জীবনে সমৃদ্ধি, জীবের প্রতি স্নেহ-প্রীতি এবং জগতের শান্তি কামনা। এই প্রার্থনাগুলোর মধ্য দিয়ে এক পরমশক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। একে ঈশ্বরবাদ বলা যায়। এখানে উল্লেখ্য, বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করে মানুষ অভীষ্ট কর্মফল লাভ করতে পারতেন। এটিকে পরবর্তীকালে বলা হলো যাগ-যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম, জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। এগুলো মোক্ষলাভের সহায়ক নয়। যজ্ঞকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে যজ্ঞকারীর অভীষ্ট ফল লাভ হয়, এমনকি স্বর্গপ্রাপ্তিও ঘটে। কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হলে জীবকে স্বর্গভোগ ছেড়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ বা মোক্ষলাভ। বৈদিক যুগের জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ ও দার্শনিক চিন্তার পর্যায়ে এসে তৎকালীন ঋষিগণ উপলব্ধি করেন, মোক্ষলাভই জীবনের উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এখানে সনাতন ধর্মচিন্তায় নতুন উপলব্ধি এসে যায়। মোক্ষলাভের সহায়ক ধর্মচিন্তায় সন্ন্যাসবাদের আবির্ভাব ঘটে। এ স্তরে মুক্তিলাভের পথ-প্রদর্শক হিসেবে বহু উপনিষদ গ্রন্থ রচনা হয়। এ পর্যন্ত দুইশতেরও অধিক উপনিষদের পরিচয় জানা গেছে। তবে কৌষিতকী, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বারোটি উপনিষদকে প্রধান ও প্রামাণ্য উপনিষদ বলা হয়। এগুলোর মধ্যেও পরস্পর মতভেদ রয়েছে। ব্রহ্মলাভের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। একেই বলা হয় বেদান্ত দর্শন।

এখানে উল্লেখ্য, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ নিয়ে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, ভেদবাদ, অভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের উত্থান ঘটে এবং হিন্দুদর্শন-চিন্তায় এক সমৃদ্ধ যুগের আবির্ভাব ঘটে। বৈদিক যুগের ধর্মচিন্তায় কাম্যকর্ম মোক্ষদায়ক নয়। তাই বেদান্তের ব্রহ্মচিন্তা হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে এক পরিবর্তন ধরা পড়ে।

এভাবে সনাতন ধর্মের দুইটি শাখা প্রকট হয়ে ওঠে; একটি কর্মমার্গ, অপরটি জ্ঞানমার্গ।

পাঠ ২ : স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র

বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান এ দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এখানে এসে জানা যায় মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দুদের জীবনচর্চার আশ্রম বিভাগে জানা গেছে, প্রথম পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা ও সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরের পঁচিশ বছর গার্হস্থ্য আশ্রমে ধর্ম সংযুক্ত অর্থ, কাম, সেবা আচরণীয়। পরে বানপ্রস্থ আশ্রমে মুনিবৃত্তি অবলম্বন এবং সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম ত্যাগ করে ব্রহ্মচিন্তায় নিমজ্জন। এখানে প্রথম দুই আশ্রমে কর্মযোগ এবং শেষের দুই আশ্রমে জ্ঞানযোগের পরিচয় মেলে। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুসমাজ পরিচালনার বিধি-বিধানও সন্নিবেশিত রয়েছে। এভাবে হিন্দুধর্মে জাগতিক এবং পারমার্থিক চিন্তার ক্রমশ বিকাশ ঘটতে থাকে।

পৌরাণিক যুগ

পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বেদ ও উপনিষদের মধ্যেও ভক্তিভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। এটি পৌরাণিক যুগে এসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আর ভক্তিমার্গের প্রাধান্য লাভ করায় সনাতন ধর্মে এক রূপান্তর সংঘটিত হয়। ভক্তিকে অবলম্বন করে পরম তত্ত্বে উপনীত হওয়ার যাত্রাপথে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রকাশ ঘটে। দেবতা একাধিক, তাই পরব্রহ্মের স্থান নিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারী ভক্তগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়।

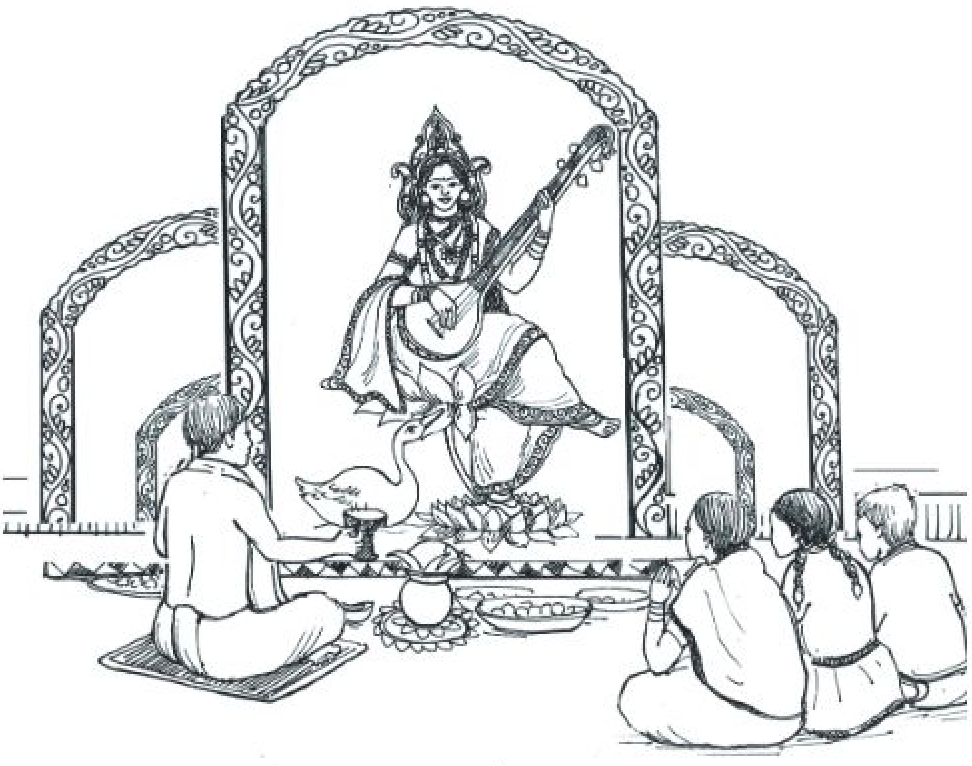

এভাবে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। আর হিন্দুধর্মের অবতার পুরুষদের মাহাত্ম্য কীর্তনে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ প্রণীত হয়। বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ভাগবতপুরাণ এবং বেশকিছু উপ-পুরাণও এই যুগে রচিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হিসেবে পূজিত হন। আবার বৈষ্ণব ধর্মমতের মতো আর একটি প্রভাবশালী ধর্মমত হলো শৈব ধর্মমত। তাদের মতে শিবই সমস্ত আগমশাস্ত্রের বক্তা।

আবার বিশ্বচরাচরে সর্বত্র শক্তির প্রকাশ। ব্রহ্ম বস্তুকে যখন সগুণ, সক্রিয় বলে ধারণা করা হয় তখনই তাঁর শক্তির চিন্তা এসে পড়ে; কেননা শক্তিরই প্রকাশ হয় ক্রিয়াতে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নির কল্পনা অসম্ভব। অনুরূপভাবে শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কর্মক্ষমতা থাকে না। সুতরাং শক্তিও পরম আরাধ্য।

এই যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তমতের উল্লেখ করা হলো, এসব মতের সবগুলোতেই সগুণ ঈশ্বর, জগতের সত্যতা এবং ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বৈদিক কর্মবাদ ও বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ থেকে পৌরাণিক ধর্মসমূহের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শাস্ত্রবচন থেকে জানা যায়, বিষ্ণু, রুদ্র, শক্তির দেবী– এঁরা সবাই এক মূলতত্ত্বের প্রকাশ বা বিকাশ–'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এক ব্রহ্মকেই মনীষীরা বিভিন্ন নামে ও রূপে অভিহিত করেন। ধর্মচর্চার অবলম্বন হিসেবে ভক্তি সনাতন সাধনার চিন্তাজগতে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যায়। ভক্তিপথে ঈশ্বর আরাধনার বিশেষ আহ্বান আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। এ গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্মের সাধন প্রক্রিয়াগুলোর কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় সংরক্ষিত ও সমন্বিত রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদার আহ্বানে হিন্দুধর্মের সমন্বয়–চেতনা বিবৃত হয়েছে।

গীতার ভক্তিবাদের প্রকাশ বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ করা যায়। এখানে ভগবানের আহ্বান রয়েছে–সতত আমাকে স্মরণ করো, আমাতে মনোনিবেশ করো। আমার ভজনা করো, আমাতেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ কর, একমাত্র আমারই শরণ লও ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ লাভ করা যায়। এই ভক্তির ধারাটি আরো বিকাশ লাভ করে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে।

পাঠ ৩ : আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ

ঊনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে তথা বাংলাদেশের হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাঁরা মনে করেন, যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধি-বিধান সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে 'যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'–যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী সংস্কারক মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সব উপাস্য যে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ,

হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে। তখন তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনার তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এভাবে তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে সাধনার আহ্বান জানালেন। স্থাপন করলেন 'ব্রাহ্মসমাজ'। তিনি বললেন ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য। হিন্দুরা একেশ্বরবাদী।

তাঁর এই সংস্কার-চেতনা সুধীমহলে নন্দিত হলেও সাধারণ মানুষ তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও পুজা-পার্বণ ত্যাগ করতে পারেনি। এদের অনুভূতিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাকার মাতৃসাধনার সাফল্যের দ্বারা। একশ্বেরবাদী ধারণা আর বহু দেব-দেবীরূপে ঈশ্বর আরাধনা এ দুইয়ের সমন্বয় সাধিত হয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমর উপদেশে–'যত মত, তত পথ'; 'যত্র জীব, তত্র শিব' ইত্যাদি বাণীর মাধ্যমে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শগুলো প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়। এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে যুগ্ম প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন বা বেদান্ত আন্দোলন সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'। এই আদর্শটি শুধু হিন্দুধর্মের প্রেক্ষাপটে নয়, এটি বিশ্ব মানবতার ক্ষেত্রেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়ে হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তাঁর এই ধর্মনীতি থেকেই মতুয়া ধর্মের উদ্ভব। এ ধর্মের মুলমন্ত্র হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা। হরিনামই জগতে কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ।

এখানে উল্লেখ্য, হিন্দুধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (পঞ্চদশ শতক) প্রেমভক্তির ধর্ম তথা আন্দোলনটি বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলনটি হিন্দুধর্ম চেতনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারীদের বিদ্বেষ এবং বর্ণভেদ প্রথা দূর করতে অনেকখানি সমর্থ হয়। প্রেমপুর্ণ ভক্তি দিয়েই পরম আরাধ্য ভগবানকে লাভ করা যায়। আর ধর্ম আচরণে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, নারী, পুরুষ সকলের সমান অধিকার রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমভক্তি অনুসরণ করে আবির্ভাব ঘটে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথের সাধক হয়ে ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর এই আদর্শকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাঁর পরম ভক্ত মহেন্দ্রজী মহানাম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন এই সম্প্রদায়ের গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র বৈষ্ণব আচার্য হচ্ছেন ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যে এবং একনিষ্ঠ ভক্তিতে কৃষ্ণ-গৌর-বন্ধু লীলা মাধুর্য প্রকাশিত। মহানাম কীর্তন জীবের উদ্ধারের উপকরণ।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তির ধর্মটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার করার মানসে ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসে নিউইয়র্ক শহরে শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ 'ইসকন' (ISKCON) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের পরিপোষক। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবদ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের ইংরেজি ভার্সন প্রকাশ করেন।

বৈরাগ্যময় জীবনের অনুসারী প্রভুপাদ সমাজ জীবন থেকে বিভিন্ন প্রকার পাপকর্ম দূর করতে সচেষ্ট হন। তাঁর অনুশীলিত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন জীবের মুক্তিলাভের অবলম্বন হয়ে জগতে নাম মাহাত্ম্য প্রচার করছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ১৮৮৮ সালে পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে–ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়; বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ সংঘের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে– যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তাঁর ছড়া, কবিতা, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন গান এগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নন্দিত হচ্ছে।

হিন্দুধর্মের বিকাশের স্তরে স্তরে যে নতুন নতুন ধর্মচর্চার রূপ প্রকাশিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে অখণ্ডমণ্ডলীর অবদান স্মরণীয়। এঁদের সংগঠনের নাম 'অযাচক আশ্রম'। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে আবির্ভূত হন। অযাচক আশ্রমের নামটির মধ্যেই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ যাচঞা না করা এ

সংগঠনের আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাই এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অযাচক আশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকা। স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শকে রূপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। এর মূল আবেদন 'আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব'। স্বামী স্বরূপানন্দ রচিত বহু গ্রন্থ, সংগীত সমাজের কল্যাণ সাধনে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনাদর্শ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। সকলের তরে সকলে আমরা– এ ছিল তাঁর কল্যাণময় জীবনভাবনা।

স্বামী প্রণবানন্দের (১৮৯৬-১৯৪১) সেবাদর্শ হিন্দু সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করছে। ১৯২১ সালে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা করেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে দূর করে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। জনগণের সেবা করার জন্য তিনি 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' নামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পরও লোকসেবা বা লোকশিক্ষার জন্য সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবা করতে থাকেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা ছিল তাঁর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র। তিনি প্রচলিত অর্থে গুরুগিরি করেননি। কিন্তু পালন করেছেন একজন লোকশিক্ষকের ভূমিকা। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তাঁকে গুরুই বিবেচনা করতেন। বাংলাদেশ এবং ভারতসহ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে লোকনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাবা লোকনাথকে কেন্দ্র করে বারদীর লোকনাথ মন্দিরের পরিচালনা পরিষদ, ঢাকার স্বামীবাগে প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ মন্দিরকেন্দ্রিক লোকনাথ সেবক সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ রকম আরও ধর্মীয় সংগঠন হিন্দুধর্মের প্রচার ও বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনায় বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান মেলে। তবে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলন সূত্র লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্ম সংস্কারপন্থী হয়েও সনাতন ভাবধারা সংরক্ষণ করে চলছে। মানব জীবনের ব্যবহারিক সমৃদ্ধিসহ আধ্যাত্মিক জীবনের পরম কল্যাণ লাভ হিন্দু ধর্মের মৌলিক স্তম্ভ। এটি যুগ পরিক্রমার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে এক অনন্য ভাবেরই দ্যোতনা বহন করছে। হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য চেতনা উপলব্ধি করে হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ গৌরব বোধ করে থাকেন।

নতুন শব্দ: সিন্ধুসভ্যতা, জ্ঞানকাণ্ড, সন্ন্যাস ধর্ম, ব্রহ্মসূত্র, শাক্ত, সমন্বয়, একেশ্বরবাদ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. একটি　　খ. দুটি
গ. তিনটি　　ঘ. চারটি

২। কোন মহাপুরুষের প্রেমভক্তি অনুসরণ করে বাঙালি হিন্দুধর্ম চেতনার আকাশে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে?

ক. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র　　খ. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
গ. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু　　ঘ. হরিচাঁদ ঠাকুর

৩। স্মৃতিশাস্ত্র বলতে বোঝায়–

i. জাগতিক এবং পারমার্থিক চিন্তার ক্রমবিকাশ
ii. জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের সমন্বয়
iii. কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নৃপেন্দ্রনাথ মুখার্জী একজন উদার মনের মানুষ। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে তাঁর গ্রামের উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ জানান। তার বাড়িতে সকলে নাম সংকীর্তনে মেতে ওঠেন।

৪। উদ্দীপকের নৃপেন্দ্রনাথের চরিত্রে তোমার পঠিত কোন মহাপুরুষের আদর্শ ফুটে উঠেছে?

ক. স্বামী স্বরূপানন্দ　　খ. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
গ. হরিচাঁদ ঠাকুর　　ঘ. শ্রীচৈতন্যদেব

৫। উক্ত মহাপুরুষের মতাদর্শ থেকে উদ্ভব হয়েছে—

ক. ভক্তিবাদ　　খ. মতুয়াবাদ
গ. অযাচক আশ্রম　　ঘ. সৎসঙ্গ সংগঠন

সৃজনশীল প্রশ্ন

শংকর বেশ কিছুদিন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কোনো চাকুরি জোগাড় করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তার ছোটবেলার বন্ধু দুর্জয় শংকরকে একটি আশ্রমে নিয়ে যায়। এ আশ্রমে কারো কাছ থেকে কোনো চাঁদা বা সাহায্য নেওয়া হয় না। এরা নিজেদের অর্থের সংস্থান নিজেরাই করে। শংকর এ আশ্রমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে।

ক. অবতারবাদ কী?

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়?

গ. শংকর কোন মহাপুরুষের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়? তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত মহাপুরুষের মতাদর্শের শিক্ষা মূল্যায়ন করো।

তৃতীয় অধ্যায়
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য যে সমস্ত আচার-আচরণ চর্চিত হয় তা-ই ধর্মাচার। এগুলো লোকাচারও বটে। এ সকল আচরণে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ আছে। অপরদিকে ধর্মশাস্ত্রে পূজা এবং অবশ্যকর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যতীত ধর্মানুষ্ঠান হয় না আবার ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে ধর্মাচার অবশ্য কর্তব্য। সংক্রান্তি উৎসব, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচারগুলোর পাশাপাশি দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানগুলোও আমাদের সংস্কৃতি।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের ধারণা দুইটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা আচারের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- প্রধান প্রধান ধর্মাচারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও নামযজ্ঞের বর্ণনা এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে ধর্মাচারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- পুণ্যতীর্থের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

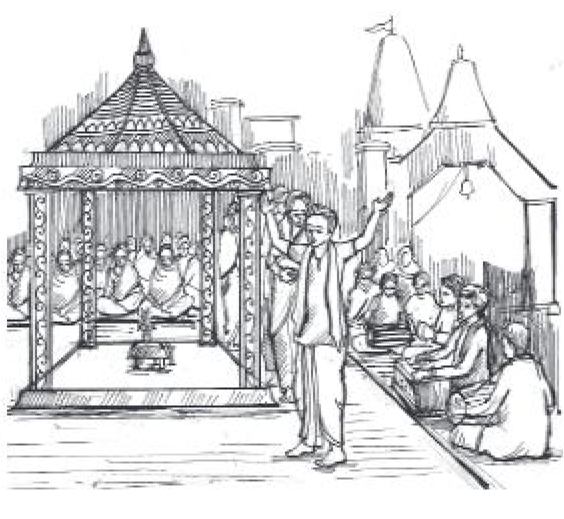

পাঠ ১ : ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সারা বছর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকে। কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্বণ। এর মধ্যে কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান। আর কিছু আছে লোকাচার। মূলত জীবনটাকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় করে রাখার চেষ্টা থাকে সতত। যে-সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে, তা ধর্মাচার নামে স্বীকৃত। এগুলোকে লোকাচারও বলে। তবে এর মধ্যে থাকে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ। আবার ধর্মশাস্ত্রে পূজাসহ নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার করতে হবে। সংক্রান্তি, বর্ষবরণ, দোলযাত্রা, রথযাত্রা উৎসবসহ এখানে কয়েকটি ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-আচারের সম্পর্ক

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-সমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার। অপরদিকে ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি প্রশংসা করে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তা-ই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-পার্বণ পরস্পর সম্পর্কিত। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত। আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয়। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু পূজার সঙ্গে মিশে আছে নানারকম ধর্মাচার। ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচারও পালন করতে হয়।

পাঠ ২ ও ৩ : কতিপয় ধর্মাচার

সংক্রান্তি

বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। এ দিনে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্রান্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষসংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। তবে পৌষপার্বণ বা পৌষসংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তিও বলা হয়। হিন্দুরা এই দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে থাকে।

চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব শিব পূজা। এর অপর নাম নীল পূজা। শিবের পূজা করা হয়। অনেক স্থানে একে বুড়োশিবও বলে। শিব পূজার একটি অঙ্গ চড়ক পূজা। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি মঙ্গলজনক উৎসব করা হয়।

গৃহপ্রবেশ

নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমিদেবতা এবং গৃহপতির অভীষ্ট দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয়।

জামাইষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। খুবই আনন্দময় অনুষ্ঠান এটি। এদিন জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ

আয়োজন করা হয়। জামাইকে নতুন কাপড়-জামা দেওয়া হয়। জামাইও শাশুড়িসহ অন্যান্য আত্মীয়কে সাধ্যমতো নতুন কাপড় প্রদান করে। এদিন ষষ্ঠীপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়।

রাখীবন্ধন

'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এ দিনটি রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এ উৎসব পালন করা হয়। এ দিনটি বড়ই পবিত্র। পুরাণে উল্লেখ আছে– কার্তিকে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁর ভাই যমের মঙ্গল কামনায় পূজা করেন। তাঁরই পুণ্যপ্রভাবে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। এ কল্যাণব্রত স্মরণে রেখে বর্তমান কালের বোনেরাও এ দিনটি পালন করে আসছে।

ভাইকে যাতে কোনো বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে, সেজন্য বোনদের সতত কামনা! এদিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়। বাঁ হাতের কড়ে অথবা অনামিকা আঙুল দিয়ে চন্দনের (ঘি, কাজল বা দধিও হতে পারে) ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে বলা হয়–

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।'

এজন্য এ অনুষ্ঠানের এক নাম 'ভাইফোঁটা'। ভাইকে ফল, মিষ্টি, পায়েস, লুচি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করা হয়। শুধু পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই নয়, এ উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্ষবরণ

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সর্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে।

দীপাবলি

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক – এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

হাতেখড়ি

সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় গুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

নবান্ন

নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। বার মাসে তের পার্বণের একটি পার্বণ।

হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

একক কাজ : প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে দুইটি করে বাক্য লেখো	সংক্রান্তি	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	দীপাবলি	হাতেখড়ি	নবান্ন

পাঠ ৪ : ধর্মানুষ্ঠান

দোলযাত্রা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার (দোলপূর্ণিমা) দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এ সময় সমস্বরে বলা হয়–'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।'

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত-উৎসবও বলা যায়।

দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। দোলযাত্রা উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে বিভেদ ভুলে যায়। সকলেই হয়ে যায় একাত্ম। এটাই দোলযাত্রার সর্বজনীনতা। বাংলার বাইরে এটি হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

রথযাত্রা

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। এই রথযাত্রা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামেই পরিচিত। উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

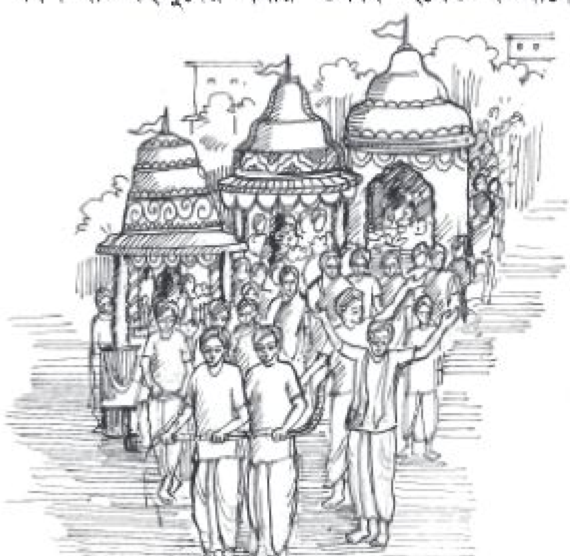

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা–জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই রথযাত্রা পালিত হয়। তবে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব বাংলাদেশে বিখ্যাত।

রথযাত্রার তাৎপর্য :

রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা দেয় সাম্যের শিক্ষা। রথের মেলা একদিকে উৎসব, অন্যদিকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

পাঠ : ৫ : ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব

নামযজ্ঞ

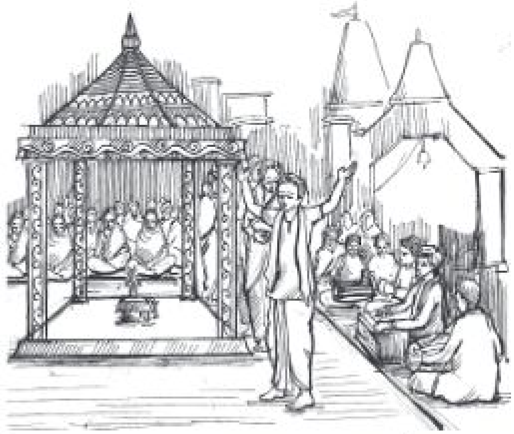

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে– শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

একক কাজ : তোমার এলাকায় অনুষ্ঠিত দোলযাত্রা অথবা রথযাত্রা অথবা নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের গুরুত্ব

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

পাঠ ৬ : বাংলাদেশের তীর্থস্থান

বাংলাদেশে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথের মন্দির, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি, নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ, নোয়াখালীর রামঠাকুরের সমাধিস্থল, পাবনার হিমাইতপুর, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের পণাতীর্থ, শ্রীহট্টের যুগলটিলা প্রভৃতি।

তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুণ্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্‌গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে স্বস্তি। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

পণাতীর্থ এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

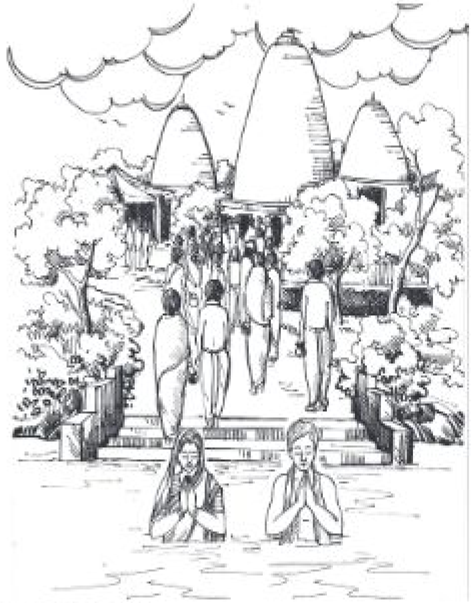

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে পণাতীর্থ স্থানটি অবস্থিত। পণাতীর্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান। এটি লাউড় পাহাড়ে অবস্থিত। চৈত্র মাসে বারুণীস্নানে এখানে বহু মানুষের সমাবেশ হয়। সাধক পুরুষ অদ্বৈত প্রভুর মা লাভাদেবীর গঙ্গাস্নানের খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে তিনি গঙ্গাস্নানে যেতে পারেননি। অদ্বৈত প্রভু তাঁর মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য যোগসাধনাবলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্যজল এক নদীর মধ্যে নিয়ে আসেন।

এই জলধারাটিই পুরনো রেণুকা নদী। বর্তমানে এটি যাদুকাটা নদী নামে প্রবাহিত। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানার এই নদীর তীরে পণাতীর্থে প্রতি বছর বারুণী স্নানে বহু লোকের সমাগম হয়।

একক কাজ : পণাতীর্থের মতো তোমার দেখা কোনো তীর্থস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'নবান্ন' উৎসবে কোন দেবীর পূজা করা হয়?

ক. সরস্বতী   খ. লক্ষ্মী

গ. দুর্গা   ঘ. মনসা

২। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি?

ক. জামাইষষ্ঠী   খ. দোলযাত্রা

গ. দীপাবলি   ঘ. শিবপূজা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্র অয়ন পহেলা বৈশাখের সকালে পূজার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল মহামিলন মেলা।

৩। অয়ন গ্রামে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে?

ক. সংক্রান্তি খ. গৃহপ্রবেশ

গ. বর্ষবরণ ঘ. নবান্ন

৪। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উক্ত অনুষ্ঠানটি অয়নের জীবনে এক মহামিলন মেলা। কারণ এ অনুষ্ঠানটি–

i. সর্বজনীন

ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার মিলন

iii. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কনক উপবাস থেকে তার ভাই সৌবর্ণের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। তার বিশ্বাস সৌবর্ণ সকল বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

ক. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়?

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়?

গ. কনক কীভাবে অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মাচারটি উদযাপন করছে, তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে কনকের পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

২। চৈত্র মাসে গোবিন্দ তার মা-বাবার সাথে লাঙ্গলবন্দ স্নানে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে তার মা-বাবার সাথে স্নান সম্পন্ন করে। স্নান শেষে হাজার মানুষের ভিড়ে লাঙ্গলবন্দ স্নান সম্পর্কে তার কৌতূহল জাগে এবং সে লাঙ্গলবন্দ স্নানের উৎপত্তি, বিকাশ ও মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

ক. পুণ্যস্থান কী?

খ. ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান ভ্রমণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

গ. গোবিন্দের তীর্থ দর্শনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে তীর্থস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তীর্থ ভ্রমণে মানুষের জীবনে যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ করো।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুধর্মে সংস্কার

আমাদের এই পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাচীন ঋষিরা ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা রচনা করেছেন 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', 'পরাশরসংহিতা' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র। এগুলো হিন্দুধর্মের বিধি বিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে বর্ণিত বিধি-বিধানকে আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া। মৃতজনের উদ্দেশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পারলৌকিক কৃত্য প্রভৃতি সম্পাদন করার বিধি-বিধানও হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত রয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বিভিন্ন সংস্কারের নাম উল্লেখ করতে পারব এবং প্রচলিত সংস্কারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় সংস্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব
- বিবাহের একটি মন্ত্রের সরলার্থ এবং মন্ত্রের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- 'হিন্দুবিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সুদৃঢ় ধর্মীয় বন্ধন'–বিশ্লেষণ করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিবাহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- 'পণপ্রথা অধর্ম' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধারণা ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শবদেহ প্রদক্ষিণ করার সময়কার মন্ত্রটি সরলার্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- অশৌচের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অশৌচ পালনের পদ্ধতি এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- শ্রাদ্ধের ধারণা ও আদ্যশ্রাদ্ধের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন

ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যে-সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার। স্মৃতিশাস্ত্রে **দশবিধ সংস্কারের** উল্লেখ আছে। যেমন- ১. গর্ভাধান ২. পুংসবন ৩. সীমন্তোন্নয়ন ৪. জাতকর্ম ৫. নামকরণ ৬. অন্নপ্রাশন ৭. চূড়াকরণ ৮. সমাবর্তন ৯. উপনয়ন ও ১০. বিবাহ।

এখানে প্রচলিত কয়েকটি সংস্কারের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

জাতকর্ম : জন্মের পর পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

নামকরণ : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিবসে নামকরণ করণীয়।

অন্নপ্রাশন : পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাশন।

সমাবর্তন : পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকমহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

বিবাহ : যৌবনে বেদ ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বর ও বধূর মিলনরূপ সংস্কারকে বলা হয় বিবাহ। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বর্তমানে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার লুপ্তপ্রায়।

পাঠ ২ : বিবাহ

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছেন পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। 'বিবাহ' শব্দটি বি-পূর্বক বহ্ ধাতু ও ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে গঠিত। বহ্ ধাতুর অর্থ 'বহন করা' এবং বি উপসর্গের অর্থ বিশেষরূপে। সুতরাং 'বিবাহ' শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভারবহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

বিবাহের প্রকারভেদ

স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে : ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত। কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যা দান করাকে বলা হয় ব্রাহ্মবিবাহ।

সমাজে গান্ধর্ব বিবাহেরও প্রচলন আছে। নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তার নাম গান্ধর্ব বিবাহ। মহাভারতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র

'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।'
(ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

"তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।" এই মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর একাত্মতার সম্পর্ক। জীবন হয় একসূত্রে গাঁথা। আমৃত্যু তারা সুখে-দুঃখে একসাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে শুরু হয় পথ চলা।

বিবাহের গুরুত্ব

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা স্বামী সন্তানের জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং স্ত্রী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার, যাকে কেন্দ্র করে প্রেমপ্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার।

পাঠ ৩ ও ৪ : বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ

হিন্দু বিবাহের কিছু বিধি বিধান শাস্ত্রীয়, কিছু অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচার। হিন্দুবিবাহ কোনো চুক্তি নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারমূলক অধ্যায়। শুভলগ্নে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে

সাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় যজ্ঞ এবং কতগুলো লোকাচারের মাধ্যমে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন– আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন, সপ্তপদীগমন, বাসি বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্রীয়, আর কিছু অঞ্চলভেদে লোকাচার।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয় কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা)

গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

একক কাজ : বিবাহের আগে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা হয় কেন? কারণ উল্লেখ করো।

মালাবদল

বর তার গলার মালাটি কনের গলায় এবং একইভাবে কনেও তার গলার মালাটি বরের গলায় পরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় পর পর তিনবার পরস্পরের মালা বদল করা হয়।

সম্প্রদান

বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি বসাতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা

পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

২০১৮

যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান- অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে। অনেক স্থানে কলাগাছ বেষ্টিত বিবাহ আসরে বর কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর সম্মুখে কনে তার পিছনে। বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোণা একত্র করে একটা গিঁটও দেওয়া হয়।

একক কাজ : বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন

সম্প্রদানপর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকেই কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

পণপ্রথা অধর্ম

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা এগিয়ে আসব। এ জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

একক কাজ : সিঁথিতে সিঁদুর পরানো একজন হিন্দু রমণীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৫ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

'অন্ত্য' ও 'ইষ্টি' এই দুটি শব্দ মিলেই অন্ত্যেষ্টি শব্দটি গঠিত। 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ শেষ এবং 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া।

মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত।

মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করতে হয়।

এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। চন্দনকাঠ পাওয়া না গেলে ক্ষতি নেই। যেখানে যেমন কাঠ প্রাপ্য তা দিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতেও শবদাহ করা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র

সাধারণত নিয়মানুসারে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র শির বা মস্তকে অগ্নিপ্রদান করে। প্রচলিত কথায় বলা হয় মুখাগ্নি। তার অভাবে কে অগ্নিপ্রদান করবে, তার একটি ক্রমধারা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

অগ্নিদানের পূর্বে শবদেহ সাত বা তিনবার প্রদক্ষিণ করতে করতে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয় :

'ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ ॥
ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্ ।
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥'

অর্থাৎ জেনে বা না জেনে তিনি হয়তো দুষ্কার্য করেছেন। এখন মৃত্যুকালবশে তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। ধর্ম, অধর্ম, লোভ ও মোহাচ্ছন্ন তাঁর শরীর দগ্ধ করুন। তিনি দিব্যলোকে গমন করুন।

দাহকার্য শেষ হলে চিতায় জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করতে হবে। শ্মশানবন্ধুগণ বা দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হবেন।

একক কাজ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটির অর্থ লেখ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব

আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি

গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন দেখতে আসেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এতে সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে আত্মা পবিত্র হয়। সকলের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মন তৈরি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।

পাঠ ৬ : অশৌচ

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন- ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ কালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়।

অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এই পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড। পূরকপিণ্ড দিতে হয় মোট দশটি। অশৌচান্তে মস্তক মুণ্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে হয় শ্রাদ্ধ। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন এবং শুদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে। তবে বর্তমানে প্রায় সকল বর্ণের বা গোত্রের মানুষ দশ দিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে, কেউ কেউ পনের দিন অশৌচ পালন করে ষোড়শ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকেন।

জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ভেদে অশৌচ দুই প্রকার। কেউ জন্মগ্রহণ করলে যে অশৌচ হয় তার নাম জননাশৌচ এবং মৃত্যুর পরে যে অশৌচ হয় তার নাম মরণাশৌচ। সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান থাকে। সুতরাং সপ্তম পুরুষ পর্যন্তই জননাশৌচ ও মরণাশৌচ পালন করার নিয়ম আছে।

অশৌচ পালনের গুরুত্ব

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুও আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

একক কাজ : মরণাশৌচ পালনের বিধানগুলো উল্লেখ করো।

পাঠ ৭ ও ৮ : আদ্যশ্রাদ্ধ

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অণ্' প্রত্যয় যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ। সুতরাং যেখানে শ্রদ্ধার সংযোগ নেই, সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর

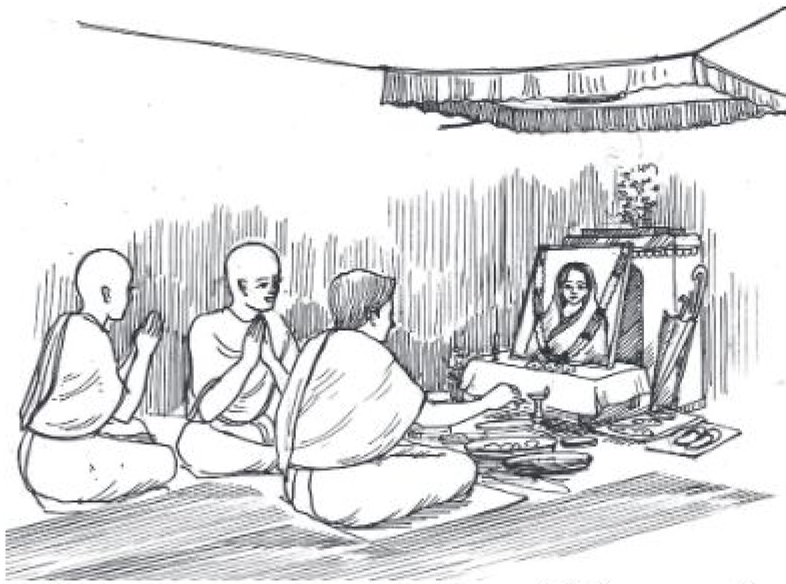

প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। অশৌচকাল উত্তীর্ণ হলে পর দিন অনুষ্ঠিত হয় এই শ্রাদ্ধ। যতদূর জানা যায়, নিমি শ্রাদ্ধের প্রবর্তক। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় শাস্ত্রে ছয়, আট, ষোলো প্রভৃতি বিভিন্ন দানের বিধান আছে। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন দানই করে থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধে গীতা ও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠেরও বিধান আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে শ্রাদ্ধবাসরে কঠোপনিষদ পাঠ করা হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় বলে তাকে বলা হয় একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। অর্থাৎ একজনের উদ্দেশে শ্রদ্ধার সাথে দান। আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করণীয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। পরে পিণ্ডদান করে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করা হয়। নারীরাও অশৌচ এবং চতুর্থী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব

আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি

মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেক জনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

> **একক কাজ :** আদ্যশ্রাদ্ধ করার সময় কী কী দান করতে হয় ?

অভিন্ন বিধানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

হিন্দু সমাজের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণবিভাজন হয়। অর্থাৎ যে যে রকম পেশায় নিয়োজিত তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'*— অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।

ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে, এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।

অশৌচ পালনের দিবসসংখ্যায় তারতম্য ও অনুষ্ঠানের ভিন্নতা যৌক্তিক নয়। আর সেজন্যই বর্তমানে প্রায় সকল বর্ণের মানুষ দশ দিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করছেন। কিন্তু এটা স্বেচ্ছাকৃত। সকল বর্ণের জন্য অভিন্ন বিধান যৌক্তিক এবং হিন্দু সমাজের সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য অভিন্ন বিধান প্রয়োজন।

নতুন শব্দ : পার্থিব, অষ্টদুর্গা, মোহাচ্ছন্ন, জননাশৌচ, মরণাশৌচ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, হবিষ্যান্ন, মুণ্ডন, বিষাদগ্রস্ত, প্রবর্তক, পাদুকা, তাম্বুল, অঙ্কুরিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে কোন বিবাহ সংঘটিত হয়?

ক. প্রাজাপত্য খ. গান্ধর্ব

গ. আসুর ঘ. ব্রাহ্ম

২। সমাবর্তন বলতে কিরূপ অনুষ্ঠান বোঝায়?

ক. পাঠগ্রহণের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে গমন

খ. পাঠগ্রহণকালে গুরুকে মূল্যবান উপহার প্রদান

গ. পাঠশেষে গুরুগৃহ থেকে বিদায়ানুষ্ঠান

ঘ. পাঠশেষে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোপাল তার ঠাকুরদার একমাত্র নাতি। চোখের সামনে ঠাকুরদার মৃত্যুতে সে শোকাহত হয়। গোপাল দেখে মৃত্যুর পর তার ঠাকুরদার দেহটিকে ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে তার বাবা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা শ্মশানে নিয়ে যায়। শাস্ত্র অনুযায়ী গোপাল ও তার বাবা মা-বার দিন অশৌচ পালন করেন।

৩। গোপালের ঠাকুরদাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কারণ কোনটি?

ক. হবিষ্যান্ন পালন খ. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গ. আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন ঘ. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

৪। তাদের অশৌচ পালনের মাধ্যমে অর্জিত হবে—

i. শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা

ii. আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদের প্রস্তুত করা

iii. শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

স্নাতক পরীক্ষা শেষে মিতার বাবা-মা তার বিবাহের দিন ধার্য করে। ঐদিন মিতাকে বস্ত্র ও অলংকার সজ্জিত করে তার বাবা তাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন।

ক. সংস্কার কী?

খ. কেন অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়?

গ. মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মিতার বিবাহ কার্যসম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা

দেব-দেবী, পূজা, পূজার উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য শ্রেণিতে আমাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা পূজা, পুরোহিতের ধারণা ও যোগ্যতা, দেবী দুর্গা, কালী, শীতলা ও কার্তিকের পূজা নিয়ে আলোচনা করব। দেবী দুর্গা ঐশ্বরিক মাতা যিনি সকল দুঃখ-দুর্দশা দূর করে আমাদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী কালী ঐশ্বরিক মহাশক্তি ও ত্রাণকর্ত্রীরূপে যে-কোনো ধরনের দুর্যোগের সময় আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন। দেবী শীতলা লৌকিক দেবী হলেও গ্রাম বাংলায় তিনি ঠাকুরানি নামে পরিচিত। তিনি শান্তির দেবী হিসেবে সকলের কাছে অতি পরিচিত। কার্তিক ভগবান শিবের পুত্র এবং দেব সেনাপতি। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা তাঁকে রক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে পূজা করে থাকেন। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেব-দেবীর পরিচয়, পূজা পদ্ধতি, প্রণাম মন্ত্র ও সমাজজীবনে এ সকল পূজার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পূজা ও পুরোহিতের ধারণা ব্যাখ্যা এবং পুরোহিতের যোগ্যতা বর্ণনা করতে পারব
- দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব
- দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ বর্ণনা করতে পারব
- দুর্গা পূজা পদ্ধতি (বোধন থেকে বিসর্জন) বর্ণনা করতে পারব
- দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কুমারী পূজা ও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দুর্গা পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নিজ জীবনাচারণে দুর্গা পূজার শিক্ষার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব
- দেবী কালীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- কালী পূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং নিজ জীবনাচরণে কালী পূজার শিক্ষার অনুশীলন করতে পারব

- শীতলা দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- শীতলা পূজার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- শীতলা পূজার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- নিজ জীবনাচরণে শীতলা পূজার প্রভাব উপলব্ধি করে পূজা-অর্চনা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব
- কার্ত্তিক দেবের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- কার্ত্তিক পূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কার্ত্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং দেব মাহাত্ম্য প্রচার ও দেবের শিক্ষা উপলব্ধি করে পূজার্চনা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব ।

পাঠ ১ : পূজা ও পুরোহিত

'পূজা' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো, যা পুষ্প কর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয় । হিন্দুধর্মে 'পূজা' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় । ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে (দেব-দেবী) সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তি সহকারে ফুল, দুর্বা, তুলসী পাতা, বিল্বপত্র, চন্দন, আতপচাল, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা করা হয় । পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেব-দেবীদের কাছে মাথা নত করা এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস । আমরা জানি, দেব-দেবীরা ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির প্রকাশ । তাই দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে 'পূজা' বলে ।

পুরোহিত

পুরোহিত শব্দটি 'পুরস্' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত । পুরস্ শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং হিত শব্দের অর্থ অবস্থান । সম্মুখভাগে যিনি অবস্থান করেন তিনি পুরোহিত । সাধারণ অর্থে পুরোহিত বলতে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারীকে বোঝানো হয় এবং যিনি পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন । সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে । এটা একটা পেশাও বটে । যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে । যজমান নিজেও পূজা করতে পারেন । তবে সাধারণত যজমান পুরোহিতকে পূজা করে দেয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন । সাধারণত ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরাই পৌরোহিত্য করে থাকেন । তবে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ এক কথা নয় । ব্রাহ্মণ বলতে যাঁদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে

সম্যক জ্ঞান ও ধারণা আছে বা যিনি ব্রহ্মবিদ, এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। পৌরোহিত্য করার সময় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যাঁরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজন করতেন, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। তাই পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণ বর্ণেরই পেশা ছিল। একালে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞান সকল বর্ণের মধ্যেই দেখা যায়। সুতরাং একালে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ধর্মনিষ্ঠ যেকোনো বর্ণের ব্যক্তিই পৌরোহিত্য করার যোগ্য। পুরোহিতের নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন :

পুরোহিতের গুণাবলি

পুরোহিত একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি পারিবারিক ও সামাজিক পূজা-অর্চনাদি পরিচালনা করে থাকেন। এ কারণেই তাঁকে নিম্নবর্ণিত গুণের অধিকারী হতে হয়–

১. হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোনো বর্ণের মানুষের পৌরোহিত্য করার সামর্থ্য
২. সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা
৩. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান
৪. নিত্যকর্ম ও পূজাবিধি সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও ধারণা
৫. ধর্মশাস্ত্রে এবং শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি ও প্রথার উপর অভিজ্ঞতা
৬. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মানুরাগী, প্রগতিশীল ও জনসাধারণের প্রতি মমত্ববোধ
৭. শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের দক্ষতা
৮. বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা
৯. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
১০. আচরণগত দিক থেকে ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং কথা ও কাজের সমন্বয়
১১. শিষ্টাচারসম্পন্ন ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী

পাঠ ২ : দেব-দেবীর ধারণা

ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে–

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

অর্থাৎ এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহু নামে বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার জন্য তাঁদের পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে তাঁরা খুশি হন। মানুষ দেবতাদের কৃপা লাভ এবং সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য পূজা করে। দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট দান করেন।

দেব, দেবী বা দেবতা শব্দ 'দিব্' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দিব্ + অচ্ = দেব। স্ত্রীলিঙ্গে দেবী বলা হয়। দিব্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। তাই বলা হয়েছে, যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর, তিনি দেবতা। দেব-দেবী ও দেবতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি দান করেন তিনি দেবতা। আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা। পুরাণে ধ্যানলব্ধ দেবতাদের বিগ্রহ বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করার বিধান উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বেদে দেবতাদের দেহ মন্ত্রময়।

দেবতাদের শ্রেণিবিভাগ

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের ওপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজা-প্রণালি বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে দেব-দেবীদের নিম্নলিখিত ভাগ করা হয়েছে—

১. বৈদিক দেবতা
২. পৌরাণিক দেবতা এবং
৩. লৌকিক দেবতা।

ক. বৈদিক দেবতা : বেদে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন– অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, অদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক পূজাপদ্ধতি ছিল যোগ বা হোম ভিত্তিক। বৈদিক উপাসনা রীতিতে প্রতিমা পূজা ছিল না। হোমানল বা অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করা হতো। অগ্নিকে বলা হয়েছে–তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, দীপ্তিময়, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক।

যজ্ঞের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার জন্য ঘৃত, পিঠা, পায়েস প্রভৃতি অর্পণ করা হতো। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডকে একটি বৃহৎ যজ্ঞ বলে মনে করতেন। তাই তাঁদের যজ্ঞকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এ সময় যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্মকর্ম। যজ্ঞের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর সান্নিধ্য লাভ করতেন।

খ. পৌরাণিক দেবতা : পুরাণে যে-সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি।

পৌরাণিক যুগে বৈদিক দেবতাদের অনেকেরই রূপের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। বেদে উল্লিখিত বিষ্ণুকে পুরাণে দেখা যায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে। কিন্তু বেদে বিষ্ণুর আকৃতি ও প্রকৃতি মন্ত্রময় প্রাকৃতিক শক্তি মাত্র। বেদের বিষ্ণু মূলত সূর্য।

গ. লৌকিক দেবতা : বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন– মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

দেব-দেবীর পূজা

সকল দেব-দেবীর পূজা একই সময় করা হয় না। অনেক দেব-দেবীর জন্য নির্দিষ্ট মাস, সময়, তিথি রয়েছে। যেমন বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। আবার ব্রহ্মা, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা বিশেষ বিশেষ তিথিতে করা হয়। সামাজিক অংশগ্রহণগত দিক থেকে পূজা দুইভাবে করা হয়–পারিবারিক পূজা ও সর্বজনীন পূজা। পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয় তাকে পারিবারিক পূজা বলে। সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণে যে পূজা করা হয়, তাকে সর্বজনীন পূজা বলে। মূলত সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

পাঠ ৩ : দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ

দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। তিনি অদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তি। তিনি জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামেও পূজিতা হন।

দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

দুঃ − গম্ + অ = দুর্গ । যে স্থানে গমন করা অত্যন্ত দুরূহ তাকে দুর্গ বলে । দুর্গ শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে দুর্গা শব্দটি গঠন করা হয়েছে এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি মহামায়া তিনি দুরধিগম্য – তাঁকে দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারা পাওয়া যায় । তাই তিনি দুর্গা । তিনি ব্রহ্মের শক্তি বলেও দুরধিগম্য এবং সাধন সাপেক্ষ । আবার দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয় । দুর্গা শব্দের আরেকটি অর্থ হলো দুর্গতিনাশিনী দেবী অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশকারিণী দেবী ।

একবার মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিল । তখন দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী দুর্গা । দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন । এজন্য দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয় । হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকেই ভক্তিভরে তাঁর পূজা করে আসছে । দুর্গা পূজায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির জনসাধারণ নানাভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে । এ কারণেই দুর্গা পূজা হিন্দু সমাজে সর্ববৃহৎ উৎসব হিসেবে বিবেচিত ।

দেবী দুর্গার রূপ

দেবী দুর্গা দশভুজা । তাঁর দশটি ভুজ বা হাত বলেই তাঁর এই নাম । তাঁর দশটি হাত তিনটি চোখ রয়েছে । এ জন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয় । তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপর অবস্থিত চোখ-জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে । তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে, যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন ।

সিংহ শক্তির ধারক । দেবী হিসেবে দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ । তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশ দিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন । দেবী দুর্গার ডানদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি । বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হলো খেটক (ঢাল), পূর্ণচাপ (ধনুক), পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু (কুঠার) । এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক ।

পাঠ ৪ : দুর্গাপূজা পদ্ধতি

উৎসবের সময় ও পূজার উপকরণ

দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বছরে দু'বার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয় এবং চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় মহালয়া উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেবীদুর্গার আগমনী ঘোষিত হয়। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে প্রতিমা স্থাপন করে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয় এবং পাঁচ দিনব্যাপী চলতে থাকে। দশম দিনে দশমী পূজার মাধ্যমে শারদীয় উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। কোনো কোনো স্থানে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে দুর্গাপূজা শুরু করা হয়। তবে ষষ্ঠী তিথি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গাপূজা শুরু করার রীতিই অধিক অনুসৃত।

তিথি অনুসারে দুর্গাপূজার সময়কে নিম্নরূপে শ্রেণিবিভাগ করা হয়–

প্রথম দিন : দুর্গার ষষ্ঠী-বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস;

দ্বিতীয় দিন : মহাসপ্তমী পূজা- নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ, সপ্তমীবিহিত পূজা;

তৃতীয় দিন : মহাষ্টমী পূজা, কুমারী পূজা, সন্ধিপূজা; চতুর্থ দিন : নবমীবিহিত পূজা; পঞ্চম দিন : দশমী পূজা, বিসর্জন ও বিজয়া দশমী।

বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্গাপূজায় বহু উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

পাঠ ৫ : দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা

ষষ্ঠীপূজা

মহালয়া অমাবস্যার পরে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পূজার আয়োজনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়।

সুষ্ঠুভাবে পূজা উদযাপন করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প করা হয়। সন্ধ্যাকালে বোধন, তারপর অধিবাস ও আমন্ত্রণ অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তমীপূজা

ষষ্ঠীর পর আসে মহাসপ্তমী। এ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমীবিহিত পূজা। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা উপকরণে ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, বস্ত্রাদি সাজিয়ে দেবীকে পূজা করা হয়। এদিনের পূজায় নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো হলো–কদলী (কলা), দাড়িম্ব (ডালিম), ধান্য (ধান), হরিদ্রা (হলুদ), মানক (মানকচু), কচু, বিল্ব (বেল), অশোক এবং জয়ন্তী। একটি কলাগাছের সঙ্গে অন্য গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একটি শাড়ি কাপড় পরানো হয়। একে বলা হয় কলাবৌ। নবপত্রিকার মধ্যে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ন নামে অধিষ্ঠিত। মূলত নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী

বৃক্ষকে পূজা করি। বৃক্ষকে সংরক্ষণ করি। আর এই বৃক্ষের মধ্যে আছে ঈশ্বরের শক্তি, দেবীর শক্তি। নবপত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা দেবী দুর্গাকেই পূজা করি। দেবীদুর্গাকে নির্দিষ্ট প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করা হয়।

প্রণাম মন্ত্র-

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বক গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ *(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১/১০/১১)*

বাংলা অর্থ : হে দেবী সর্বমঙ্গলা, শিবা, সর্বার্থসাধিকা, শরণযোগ্যা, গৌরি, ত্রিনয়না, নারায়ণি– তোমাকে নমস্কার।

প্রণাম মন্ত্রের শিক্ষা

দেবী দুর্গা বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন এবং আমাদের মঙ্গল নিশ্চিত করেন। তাই তিনি সর্বমঙ্গলা। তিনি শিবা অর্থাৎ মঙ্গলময়ী। শিবের শক্তি বলেও তিনি শিবা। তিনি সকল প্রার্থনা পূরণ করেন, তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তিনি শরণ্য। তিনি গৌরী। তাঁর কাছে শক্তি প্রার্থনা করে আমরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াব এবং নিজের ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করব। দুর্গাপূজার প্রণামমন্ত্র আমাদের এ শিক্ষাই দেয়।

পাঠ ৬ ও ৭ : মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা

শারদীয় দুর্গা উৎসবে অষ্টমী পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূজা। এ দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে বিজয় লাভ করেছিলেন। এ পূজার দিনে ভক্তবৃন্দ বিধিসম্মতভাবে অষ্টমীবিহিত পূজা করে দেবী দুর্গার কৃপা প্রার্থনা করেন। পূজার শেষে পূজারিগণ দেবীর উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

কুমারী পূজা

অষ্টমী পূজার দিন কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

২০১৮

এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

নবমী ও দশমী পূজা

নবমী পূজা

নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার নবমীবিহিত পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধির সময় বিশেষভাবে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধি পূজায় ১০৮টি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলন করে দেবীর পূজা করা হয়। এ সময় দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দশমী পূজা

দশমী তিথিতে পূজাবিধি অনুসারে দেবী দুর্গার দশমীবিহিত পূজা করা হয়। দশমীর দিনে হয় দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন। পূজার দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী। দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে। তিনি শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি আসেন। চারদিন থেকে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৈলাস ভবনে যাত্রা করেন। দুর্গাপ্রতিমা নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও আচার

বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও প্রধান প্রধান আচারের মধ্যে আছে–

১. দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো।
২. সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
৩. পরস্পর আলিঙ্গন করা এবং মিষ্টিমুখের মাধ্যমে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধকরণ।
৪. আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মিছিল করে ঢাক, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন।
৫. বাড়িতে ফিরে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান-দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা।
৬. আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বা অর্থ ও উপহার প্রদান প্রভৃতি।
৭. বিসর্জনের দিন বা পরের দিন কোন কোন অঞ্চলে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয়া দশমীর তাৎপর্য

১. মহিষাসুরকে বধ করার মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব পালিত হয়। সুতরাং এ দশমী বিজয়ের দিন। অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন।
২. দেবী দুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমী ঐক্যের প্রতীক।
৩. বিজয়া দশমী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশুভশক্তিকে দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করে।

বিজয়া দশমীর প্রভাব

দুর্গাপূজার প্রভাবে অন্যায়-অবিচারকে প্রতিহত করার শক্তি জাগ্রত করে।

সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। দুর্গাপূজাকে অবলম্বন করে পত্র-পত্রিকায় পূজাসংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পূজাসংগঠন শারদীয় পূজার স্মরণিকা প্রকাশ করে। পূজামণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পূজামণ্ডপ এবং প্রতিমায় নানা নান্দনিক রূপকল্পনার প্রতিফলন হয়। সার্বিকভাবে দুর্গাপূজা এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে দুর্গাপূজার প্রভাব

আবহমানকাল থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। এ উৎসব তাদের প্রাণ। শারদীয় দেবীর পূজা মানে দেবী দুর্গার আরাধনা। তিনি বিশ্বের আদি কারণ এবং ঈশ্বরের শক্তির রূপ। দুর্গাপূজা আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ ৮ ও ৯ : দেবী কালী– কালী দেবীর পরিচয়

দেবী কালী দুর্গাদেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ংকরী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দুর করার জন্য দেবী কালী অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেন।

কালী ভগবান শিবের সহধর্মিণী এবং বিশেষ শক্তি। তিনি কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কারণে তাকে শ্মশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়াও দেবী কালীর অনেক নাম রয়েছে। যেমন: ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মা তারা, শ্যামা, মহাকালী ইত্যাদি।

দেবী কালীর উৎপত্তি

দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নানা বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্নরূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তাঁর—অম্বিকা ও কালিকা বা কালী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুণ্ডা।

কালীপূজার সময়

কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। কালীপুজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রাহয়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয় যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারির (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়।

কালীপূজা পদ্ধতি

দুর্গাপুজার মতো কালী পূজাও গৃহে বা মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষু দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালী পূজা শুরু হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, পূজা, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

কালীপূজার প্রণাম মন্ত্র, সরলার্থ ও শিক্ষা

কালী পূজার ধ্যান

ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোর-দংষ্ট্রাবরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম ॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥

সরলার্থ : দেবী কালী শবারূঢ়া, ভীমা ভয়ংকরী, তিনি ত্রিনয়নী, ভয়ানক তাঁর দাঁত, লোল জিহ্বা তাঁর। তিনি মুক্তকেশী, হাতে নরকপাল ও কর্তৃকা (কাটারি)। অপর দুহাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী আবার হাস্যময়ী।

এখানে কোমল ও কঠোর রূপে দেবী কালীর রূপ বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষা

১. দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর

কাছ থেকে আমরা মঙ্গল সাধন করার শিক্ষা পাই। দেবী কালীর কাছে আমরা অন্যায়ের কাছে কঠোর, সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই।

২. অন্যায়কারীর কাছে দেবী রাগী, ভয়ংকরী। ভক্তের কাছে স্নেহময়ী জননী।

আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব

দেবী কালী ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একাধারে কঠোর, অপরদিকে মমতাময়ী মা। তিনি এ বিশ্বের সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস করে সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দেবী কালীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে থাকেন। এ পূজার মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কার্ত্তিক

পাঠ ১০ : কার্ত্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র

কার্ত্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্ত্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী। পুরাণে আছে, তারকাসুরের আধিপত্য থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁকে সেনাপতিরূপে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণের মতো।

যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্ত্তিকের হাতে তির, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্ত্তিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। পুরাণ অনুসারে তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্ত্তিকের জন্ম হয়েছিল। তিনি বলির পুত্র বাণাসুরকেও পরাজিত করেছিলেন। কার্ত্তিকের অন্য নাম স্কন্দ, মহাসেন, কুমার গুহ ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণ কার্ত্তিককে নিয়ে রচনা করা হয়েছে।

কার্ত্তিক পূজা

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। কথিত আছে, দেবকী কার্ত্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

কার্ত্তিক দেবতার ধ্যান

ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্ ॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্ ।
প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্ ॥

সরলার্থ : কার্ত্তিকদেব মহাভাগ, ময়ূরের উপর তিনি উপবিষ্ট । তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ । তাঁর দুটি হাতে শক্তি নামক অস্ত্র । তিনি নানা অলংকারে ভূষিত । তিনি শত্রু হত্যাকারী । প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল তাঁর মুখ ।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিসূদন ।
প্রণোতোঽহং মহাবাহো নমস্তে শিখিবাহন ॥
রুদ্রপুত্র নমস্তুভ্যং শক্তিহস্ত বরপ্রদ ।
ষান্মাতুর মহাভাগ তারকান্তকর প্রভো ।
মহাতপস্বী ভগবান্ পিতুর্মাতুঃ প্রিয় সদা ॥
দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতস্তং গিরিশিখরে ।
শৈলাত্মজায়াং ভবতে তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥

সরলার্থ : হে মহাভাগ, দৈত্যদলনকারী কার্ত্তিক দেব তোমায় প্রণাম করি । হে মহাবাহু, ময়ূর বাহন, তোমাকে নমস্কার । হে রুদ্রের (শিব) পুত্র, শক্তি নামক অস্ত্র তোমার হাতে । তুমি বর প্রদান করো । ছয় কৃত্তিকা তোমার ধাত্রীমাতা । জনক-জননী প্রিয় হে মহাভাগ, হে ভগবান, তারকাসুর বিনাশক, হে মহাতপস্বী প্রভু তোমাকে প্রণাম । দেবতাদের যজ্ঞ রক্ষার জন্য পর্বতের চূড়ায় তুমি জন্মগ্রহণ করেছ । হে পার্বতী দেবীর পুত্র তোমাকে সতত প্রণাম করি ।

কার্ত্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব

১. কথায় বলে কার্ত্তিকের মতো চেহারা । অর্থাৎ কার্ত্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ । এ কারণে কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন ।

২. কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি । তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা । এজন্য তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয় ।

৩. কার্ত্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা । কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা । তিনি তারকাসুর পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । আমরা কার্ত্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি । তাঁকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি ।

৪. আমাদের সকলকেই কার্ত্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

পাঠ ১১ : দেবী শীতলা

শীতলা দেবীর পরিচয়

- শীতলা লৌকিক দেবী। শীতলা পুরাণে গৃহীত হয়ে পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলা পূজা করা হয়।

- দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী, মাথায় কুলাকৃতির মুকুট এবং গর্দভের উপর উপবিষ্ট। গর্দভ তাঁর বাহন। স্কন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দু'হাত বিশিষ্ট। তাঁর দু'হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারণী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ।

শীতলা পূজা

সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজামন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও এ পূজার সময় ঠান্ডা জাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশে সমর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।

পূজার প্রণাম মন্ত্র
ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সুর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।

সরলার্থ : গর্দভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস-হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

শীতলা পূজার গুরুত্ব

১. শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন।

২. দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।

৩. দেবী শীতলার দুই হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে শীতল করেন। আমরাও বসন্তে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করে তাদের শীতল করব। শীতলা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা এ ধরনের সেবামূলক কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম বৃক্ষ রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম গাছ রোপণ করতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন্ দেবতাকে ষড়ানন বলা হয়?

ক. গণেশ   খ. অর্জুন
গ. কার্ত্তিক   ঘ. শিব

২। কোন্ তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়?

ক. পঞ্চমী   খ. ষষ্ঠী
গ. সপ্তমী   ঘ. অষ্টমী

৩। দুর্গা স্নানের জন্য প্রয়োজন হয় কোন মিলিত স্থানের মাটি–

i. তিন রাস্তা
ii. দুই রাস্তা
iii. চার রাস্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শুক্লা এ বছর বৃক্ষমেলা থেকে একটি বেল গাছের চারা ক্রয় করে বাড়ির আঙিনায় রোপণ করে। প্রতিদিন সে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছটি বড় করে তোলে।

৪। শুক্লার ক্রয়কৃত গাছটি কোন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

ক. কার্ত্তিক   খ. শিব
গ. বিশ্বকর্মা   ঘ. গণেশ

৫। শুক্লার বৃক্ষ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে–

i. ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা

ii. বৃক্ষপ্রীতি

iii. সৌন্দর্য বর্ধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

পলাশপুর গ্রামে হঠাৎ বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা একত্রিত হয়ে এক বিশেষ পূজার আয়োজন করে এবং ভক্তিপূর্ণ মনে বিভিন্ন উপচারে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম মন্ত্রের মধ্য দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করে।

ক. দেবতা বলতে কী বোঝ?

খ. লৌকিক দেবতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রামবাসীরা কোন্ বিশেষ পূজার আয়োজন করে? উক্ত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে উক্ত পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়
যোগসাধনা

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ‘যোগ’ মানে মিলন। সংযমপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধি লাভকে যোগ বলা হয়। যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না তাকে যোগাসন বলে। আর যোগের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার প্রক্রিয়াকে যোগসাধনা বলে। ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ ও মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং দেহকে সুস্থ রাখা, মনকে শান্ত রাখা এবং ধর্ম সাধনার জন্য যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে যোগসাধনা, অষ্টাঙ্গ যোগ ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী যোগসাধনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্মানুষ্ঠানে যোগসাধনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- অষ্টাঙ্গ যোগের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বৃক্ষাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বৃক্ষাসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- অর্ধকূর্মাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অর্ধকূর্মাসনের অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- গরুড়াসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- গরুড়াসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- হলাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হলাসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব ।

পাঠ ১ : যোগসাধনার ধারণা ও গুরুত্ব

যোগসাধনার ধারণা

'যোগ' শব্দটি সাধারণভাবে মিলনের অর্থই ব্যক্ত করে। একের সঙ্গে অপরের মিলন বা একত্রিত হওয়া বা তাদের একত্রিত করাকে যোগ বলা হয়। কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে এর অর্থ আরো গভীরে নিহিত। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধনা।

ব্রহ্ম এক হয়েও বহু, নির্গুণ হয়েও সগুণ, অরূপ হয়েও রূপময়, নৈর্ব্যক্তিক হয়েও ব্যক্তিস্বরূপ, অব্যক্ত হয়েও চরাচরে ব্যক্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টার নাম যোগসাধনা। তাঁর অস্তিত্বও অনন্ত, চেতনাও অনন্ত, আনন্দও অনন্ত। তিনি বিশ্বময়, আবার তিনি বিশ্বাতীত-সচ্চিদানন্দ। এ ব্রহ্মের সঙ্গে চাই যোগ। সুতরাং যোগের মাধ্যমে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের আরাধনার প্রক্রিয়াকে যোগসাধনা বলে।

যোগসাধনা মুক্তি লাভের একটি বিশেষ উপায়। মুক্তি লাভের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আত্মোপলব্ধির। আর এই আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ, স্থির ও প্রশান্ত মন। এজন্য শরীর ও মনকে উপযোগী করতে হয়। তাই শরীর সুগঠিত, সুস্থ ও মনকে নিরুদ্বেগ রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তার নামও যোগ। বিশেষভাবে একে হঠযোগ বলে। হঠযোগ হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগের প্রথম সোপান।

যোগসাধনার গুরুত্ব

দেহকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রাখতে এবং ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। যোগের মাধ্যমে পাচনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠে, যার ফলে শরীর সুস্থ, হালকা এবং স্ফূর্তিদায়ক হয়ে ওঠে। যোগ সাধনা দ্বারা হৃদরোগ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা মেদের পাচন হয়ে শরীরের ওজন কমে এবং শরীর সুস্থ ও সুন্দর হয়। স্থূলকায় মানুষের শরীর ও মন সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য যোগের বিকল্প নেই। যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং মনের নিগ্রহ হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসের দ্বারা সাধক পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। ব্যাসদেব বলেছেন, 'যোগই হলো এক অর্থে সমাধি।' পুরাকালে মুনিঋষিগণ যোগসাধনার বলেই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতেন। যোগাসনের মাধ্যমে তাঁরা নীরোগ থাকতেন ও ধ্যানে, তপ-জপে এবং প্রাণায়ামে নিজেদের দেহ সুস্থ-সবল রাখতেন ও দুশ্চিন্তাহীন মনের অধিকারী হতেন।

যোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যোগসাধনায় কেবল যোগ ঐশ্বর্য লাভ করেই তৃপ্ত হন; আবার কেউ কেউ কঠোর তপস্যায় মায়াপাশ ছিন্ন করে পুনরায় যোগশক্তির মাধ্যমে বিশ্বজনের হিতে কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। তাঁরা আত্মসমাহিত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। যোগসাধনাবলে এই আত্মসমাধি ও যোগধারণার সূক্ষ্ম নিদর্শন সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম বলেছেন, ধনুর্ধারী যোদ্ধারা যেমন অপ্রমত্ত সমাহিত চিত্তে লক্ষ্যভেদ করে তেমনি যোগীরা অনন্যমনে একনিষ্ঠ সাধনায় মোক্ষলাভ করেন। যোগতত্ত্ববিদ মহাত্মারা একাগ্রচিত্তে সংসারের মায়াতরঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এক করে দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যে যোগী অহিংসাব্রত পরায়ণ হয়ে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ করতে পারেন তিনি যোগবলে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যোগীরা ইন্দ্রিয়কে মনের মধ্যে সমাহিত করে মনকে অহংকারে, অহংকারকে মহত্ত্বে, মহত্ত্বকে প্রকৃতির রাজ্যে বিলীন করে পরমব্রহ্মের ধ্যানে তন্ময় হন। সেই পরমব্রহ্মের জ্যোতি তাঁর পাপমুক্ত নিত্য শুদ্ধ হৃদয়ে সর্বদা অনুভূত, সে জ্যোতি তাঁর চোখে-মুখে প্রতিভাত ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যোগী পুরুষ সতত প্রসন্নচিত্ত। তিনি প্রগাঢ় নিদ্রাসুখতৃপ্ত ব্যক্তির মতো প্রশান্তিসম্পন্ন হয়ে সর্বদা শান্তির রাজ্যে আনন্দের অমিয়সাগরে ভাসেন। তিনি নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির এবং তিনি জগতের কোনো আসক্তি, কোনো মমতাতেই বিচলিত হন না। দেহ অবসানে তিনি মোক্ষ লাভ করে পরমব্রহ্মে বিলীন হন।

দলীয় কাজ : যোগসাধনার প্রভাব লিখে একটি তালিকা তৈরি করো।

নতুন শব্দ : স্বতন্ত্রসত্তা, চরিতার্থতা, গতানুগতিক, চরাচর, পাসনতন্ত্র, সুডৌল, নিগ্রহ, জ্যোতির্ময়, আত্মসমাহিত, তন্ময়, অপ্রমত্ত, প্রসন্নচিত্ত, প্রগাঢ়, অমিয়, নির্বাত, নিষ্কম্প, বিলীন।

পাঠ ২, ৩ ও ৪ : অষ্টাঙ্গযোগের ধারণা ও গুরুত্ব

অষ্টাঙ্গযোগের ধারণা

প্রতিটি মানুষই নিজ জীবনে সুখ চায়। যোগসাধনা এমন এক পথ যাতে প্রতিটি মানুষ নির্ভয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে চলতে পারবে এবং নিজেদের জীবন সম্পূর্ণ সুখ, শান্তি এবং আনন্দের মাধ্যমে কাটাতে পারবে। সেই পথ হচ্ছে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রতিপাদিত অষ্টাঙ্গ যোগের পথ।

মহর্ষি পতঞ্জলি মানুষের আত্মানুসন্ধানে যোগের আটটি ধাপ নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ। এগুলো একত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে পরিচিত। আমরা এখন অষ্টাঙ্গ যোগের প্রতিটি যোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি :

১. যম

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম ধাপ হচ্ছে যম। যম অর্থ সংযম, ইন্দ্রিয় এবং মনকে হিংসা অশুভভাব ইত্যাদি থেকে সরিয়ে আত্মকেন্দ্রিক করা। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ–এই পাঁচ প্রকার যম।

ক. অহিংসা

অহিংসা শব্দটার অর্থ হচ্ছে কোনো প্রাণীকে মন, কথা এবং কর্ম দ্বারা কষ্ট না দেওয়া। মনে মনেও কারও অনিষ্ট না ভাবা, কাউকে কটু কথা ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট না দেওয়া এবং কর্ম দ্বারা কোনো অবস্থাতে কোনো স্থানে, কোনো দিন কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা ভাব প্রদর্শন না করা। এককথায় ভালোবাসা। শুধু জীবের প্রতি ভালোবাসা নয়, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা।

খ. সত্য

যেমন দেখেছি, যেমন শুনেছি এবং যেমন জেনেছি, ঠিক তেমনটাই মনে, কথায় ও কাজে করাকে সত্য বলে। মন যদি সত্য চিন্তা করে, জিহ্বা যদি সত্য কথা বলে এবং সমগ্র জীবন যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

গ. অস্তেয়

অস্তেয় অর্থ চুরি না করা। অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্তেয় (চুরি) বলে। তাই যোগী তাঁর জাগতিক প্রয়োজন সর্বনিম্ন মাত্রায় আবদ্ধ রাখেন। যোগীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর সান্নিধ্য।

ঘ. ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং পবিত্র সংযত জীবনযাপন। জীবনে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা করলে দেহে শক্তি পাওয়া যায়, মনে সাহস পাওয়া যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়। ব্রহ্মচর্যে যোগীর জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে, তখন তাঁর ঈশ্বরদর্শন সহজ হয়।

ঙ. অপরিগ্রহ

অপরিগ্রহ মানে গ্রহণ না করা। অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা যেমন তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও গ্রহণ না করা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুষ্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

২. নিয়ম

অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় হচ্ছে নিয়ম। মহর্ষি পতঞ্জলি শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

ক. শৌচ

শৌচ বলে শুদ্ধিকে, পবিত্রতাকে। এই শৌচ দুই প্রকারের হয় : এক বাহ্য এবং দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ। সাধকের প্রতিদিন জল দ্বারা শরীরের শুদ্ধি, সত্যাচরণ দ্বারা মনের শুদ্ধি, বিদ্যা আর তপ দ্বারা আত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি করা উচিত।

খ. সন্তোষ

সন্তোষ অর্থ সম্যক তৃপ্তি। এই সন্তোষ হঠাৎ আসে না, একটু একটু করে তাকে মনের মধ্যে জাগাতে হয়। মনে সন্তোষ না থাকলে কোনো কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না। যোগীর অভাব বোধ থাকে না, তাই তার মনে কোনো অসন্তোষও থাকে না। তাঁর মনে যে সন্তোষ থাকে তাতে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করেন।

গ. তপ

তপ হচ্ছে কোনো সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা। সেই সাধনায় প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি, আত্মশাসন ও আত্মসংযম। যোগে তপ বলতে বোঝায় ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তিম মিলনের জন্য সচেতন চেষ্টা।

ঘ. স্বাধ্যায়

স্বাধ্যায় মানে বেদ-অধ্যয়ন, শাস্ত্র অধ্যয়ন বা ভগবদ্‌বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নও বলা যেতে পারে। স্বাধ্যায় থেকে যেসব মহান চিন্তা উদ্ভূত হয় তা স্বাধ্যায়ীর রক্তস্রোতে মিশে যায় এবং তাঁর জীবনে ও সত্তায় অঙ্গীভূত হয়।

ঙ. ঈশ্বর-প্রণিধান

প্রণিধান অর্থ অর্পণ। সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরে সব অর্পণ করলে অহং বা অহংকার নাশ হয়। ঈশ্বরে যাঁর বিশ্বাস আছে তাঁর জীবনে কখনও হতাশা আসে না। তাঁর জীবন তেজে ভরে ওঠে। যোগী তাঁর সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন। তাই তাঁর সমস্ত কর্মে তাঁর ভিতরকার দেবত্ব ফুটে ওঠে।

৩. আসন

আসন অর্থ স্থির হয়ে সুখে অধিষ্ঠিত থাকা–স্থিরসুখম্‌আসনম্‌। দেহমনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থান তাকে আসন বলে। আসনে শরীরে দৃঢ়তা আসে, শরীর নীরোগ ও লঘুভার হয়। একটা স্থির ও সুখকর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আসনে শরীরে ও মনে সমন্বয় ঘটে। যোগী আসনে দেহকে জয় করে তাকে আত্মার বাহন হিসেবে গড়ে তোলেন। আসন নানা প্রকার। যেমন- পদ্মাসন, সুখাসন, গোমুখাসন, হলাসন ইত্যাদি। এই আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগীপুরুষ নিজ দেহ ও মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করেন। যোগসাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে কোনো গুরু বা যোগীর নিকট এই আসন প্রক্রিয়া শিক্ষা করা দরকার।

৪. প্রাণায়াম

প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের আয়াম। প্রাণ হলো শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু আর আয়াম হলো বিস্তার। সুতরাং প্রাণায়াম বলতে বোঝায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাস বিস্তারিত অর্থাৎ দীর্ঘতর করা হয়। কারণ, যোগীর আয়ু দিনগণনায় স্থির হয় না, স্থির হয় শ্বাস গণনায়। কতবার তিনি শ্বাস গ্রহণ করলেন তা দিয়েই তাঁর আয়ু পরিমাপ করা হয়। যত বেশি তিনি শ্বাস গ্রহণ করবেন তত বেশি তাঁর আয়ুক্ষয় হবে। সেই কারণে তিনি ধীরে ধীরে গভীরভাবে ও ছন্দোবদ্ধভাবে শ্বাস গ্রহণ করেন। এইরকম ছন্দোবদ্ধভাবে শ্বাস গ্রহণ করলে শ্বসনতন্ত্র বলিষ্ঠ হয়, স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে এবং কামনাবাসনা হ্রাস পায়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক–এই তিন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়। শ্বাস গ্রহণকে বলে পূরক, শ্বাসত্যাগকে বলে রেচক এবং শ্বাস ধারণকে বলে কুম্ভক। প্রাণায়ামকে একধরনের বিজ্ঞান বলা যেতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান। তবে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান ছাড়া কখনো পূরক-রেচক-কুম্ভক সমন্বিত প্রাণায়াম করা উচিত নয়।

৫. প্রত্যাহার

প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া। বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াকে যোগে প্রত্যাহার বলে। দৃঢ়সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয় আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে।

৬. ধারণা

মনকে বিশেষ কোনো বিষয়ে স্থির করা বা আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা। ধারণা অর্থ একাগ্রতা। একাগ্রতা ছাড়া জগতে কিছুই আয়ত্ত করা যায় না। কোনো বিষয় আয়ত্ত করতে হলে চিত্তবৃত্তিকে বিষয়ান্তর থেকে প্রত্যাহৃত করে ঐ বিষয়ে স্থাপন করতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হতে হয়। একাগ্রচিত্ত হতে হলে এক-তত্ত্ব অভ্যাস করতে হয়। নিজ দেহের অঙ্গবিশেষে যেমন– নাভি, নাকের অগ্রভাগ বা ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থানে অথবা কোনো দেবমূর্তি বা যে কোনো বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করা যেতে পারে। মনকে কোনো বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে নিবিষ্ট রাখার অভ্যাসের দ্বারা যোগী অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর যোগ্যতা অর্জন করে। ধারণা হচ্ছে ধ্যানের ভিত্তিস্বরূপ।

৭. ধ্যান

ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। মন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করে তাহলে দীর্ঘ চিন্তনের পর অন্তিমে ঈশ্বরোপম হতে পারে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং তিনি এমন এক সচেতন অতিন্দ্রীয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলোও দেখতে পান।

৮. সমাধি

সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করতে পারলে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ ঘটে, সাধকের অন্বেষণের শেষ হয়। ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন তিনি মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

পাঠ ৫ : অষ্টাঙ্গযোগের গুরুত্ব

অষ্টাঙ্গযোগ অনুসরণ ও অনুশীলনে মানুষের অশান্ত মন শান্ত হয় ও তার আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রমত্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে, খাল খনন করে যখন তাকে সঠিকভাবে বশে আনা হয় তখন এক বিশাল জলাধার সৃষ্টি হয়, সেই জলাধারের জলে ফসল ফলে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, মানুষের জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। ঠিক তেমনি অষ্টাঙ্গযোগ পালন করে অশান্ত মনকে বশে আনতে পারা যায় বিধায় শান্তির পারাবার সৃষ্টি হয়, আত্মোন্নয়নে অপরিমেয় শক্তি লাভ করা যায়।

অষ্টাঙ্গযোগ পালন না করে কোনো ব্যক্তিই যোগী হতে পারে না। যম এবং নিয়ম হচ্ছে অষ্টাঙ্গযোগের আধার। যম আর নিয়মে সাধকের ভাব আর আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জগতের অন্যসব মানুষের সঙ্গে তাঁর একটা ঐকতান সৃষ্টি হয়। আসনে দেহ ও মন সুস্থ সবল ও সতেজ হয়, তখন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটা ঐকতান সৃষ্টি হয়। শেষে তাঁর দেহসচেতনতা লুপ্ত হয়ে যায়। দেহকে তিনি জয় করে আত্মার বাহন হিসেবে প্রস্তুত করেন। প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সাধকের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করে তাঁর মনকে বশে আনে। তাতে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষার দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধককে তাঁর আত্মার অন্তরতম প্রদেশে নিয়ে যায়। সাধক তখন ঈশ্বরানুসন্ধানে স্বর্গের দিকে তাকান না। তখন তাঁর উপলব্ধি হয় ঈশ্বর আছেন তাঁরই অন্তরে অন্তরাত্মা নামে।

অষ্টাঙ্গযোগ ধর্ম, আধ্যাত্ম, মানবতা এবং বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রয়োজনীয় রূপে প্রমাণ করেছে। পৃথিবী থেকে খুন, সংঘর্ষ যদি কোনো উপায়ে বন্ধ করতে হয়, তাহলে সেটা অষ্টাঙ্গযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। যদি পৃথিবীর সব লোক বাস্তবে এই ব্যাপারটা নিয়ে একমত হয় যে, বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হওয়া উচিত, তাহলে তার একমাত্র সমাধানই হচ্ছে অষ্টাঙ্গযোগের চর্চা। অষ্টাঙ্গযোগে জীবনের সাধারণ ব্যবহার থেকে শুরু করে ধ্যান এবং সমাধিসহ অধ্যাত্মের উচ্চতম অবস্থাগুলোর অনুপম সমাবেশ রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বের খোঁজ করে এবং জীবনের পূর্ণ সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, তাহলে তাঁর অষ্টাঙ্গযোগের পালন অবশ্যই করা উচিত।

অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারাই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক একতা, শারীরিক সুস্থতা, বৌদ্ধিক জাগরণ, মানসিক শান্তি এবং আত্মিক আনন্দের অনুভূতি হতে পারে।

একক কাজ : অষ্টাঙ্গযোগ পালনের উপকারিতা লিখে একটি তালিকা তৈরি করো।

নতুন শব্দ : প্রতিপাদিত, আত্মকেন্দ্রিত, জাগতিক, সম্যক, শ্বসনতন্ত্র, প্রত্যাহৃত, ঈশ্বরোপম, লীন, অন্বেষণ, উত্তুঙ্গ, নিরাময়, প্রমত্তা, পারাবার, ঐকতান, বৈষয়িক।

পাঠ ৬ : বৃক্ষাসনের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রভাব

বৃক্ষাসনের ধারণা ও পদ্ধতি

এই আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের ন্যায় হয় বলে একে বৃক্ষাসন বলে।

দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাঁ উরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে, পায়ের আঙুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এখন কেবল বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবার নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুইটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে, তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুইটি সোজা মাথার উপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এইভাবে নিশ্চল হয়ে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুইটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁ পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে।

এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এইভাবে নিশ্চল হয়ে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুইপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এই হলো একবার। এই রকম তিনবার করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। বাঁ পায়ে যতক্ষণ করা হবে ডান পায়েও ততক্ষণ করতে হবে এবং ততক্ষণই শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : বৃক্ষাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

বৃক্ষাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে–

১. শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৩. পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে।

৪. উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।

৭. হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল, নমনীয় হয়।

৮. পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনোদিন বাত হতে পারে না।

৯। যাঁদের হাত-পা কাঁপে, পা দুর্বল তাঁদের খুব উপকার হয়।

১০। রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনীতে যে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে, যাকে অ্যাথেরোমা বলে, তা রোধ হয়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

একক কাজ : বৃক্ষাসন অনুশীলনের পাঁচটি উপকারিতা লেখ।

নতুন শব্দ : বৃক্ষাসন, দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা, স্নায়ুতন্ত্রী, গ্রন্থি, কোলেস্টেরল, ধমনী, অ্যাথেরোমা, থ্রম্বোসিস।

পাঠ ৭ : অর্ধকূর্মাসনের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রভাব

অর্ধকূর্মাসনের ধারণা ও পদ্ধতি

'কূর্ম' অর্থ কচ্ছপ। এই আসনে আসনকারীর দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলে। হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া থাকবে, নিতম্ব থাকবে গোড়ালির উপর। পায়ের তলা উপর দিকে ফেরানো থাকবে। হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে।

নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙুল জড়িয়ে ধরতে হবে। হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। তখন দেখাবে একটা মন্দিরের চূড়ার মতো। এবার হাত সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিঃশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এইভাবে তিনবার করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ আছে এমন রোগীদের এই আসন করা নিষেধ।

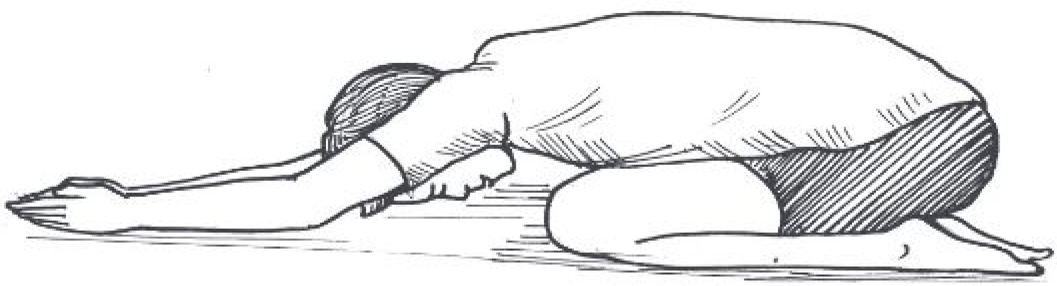

প্রভাব

অর্ধকূর্মাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে–

১. শরীর অনেক শিথিল হয়।

২. মেরুদণ্ড সতেজ হয়।

৩. পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়।

৪. আসনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে।

৫. মস্তিষ্ক শান্ত হয়।

৬. যকৃৎ ভালো থাকে।

৭. অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয়।

৮. হজমশক্তি বাড়ে।

৯. পেটে বায়ু থাকলে তার প্রকোপ কমে।
১০. হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়।
১১. পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে।
১২. কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়।
১৩. পেটের ও নিতম্বের চর্বি কমে।
১৪. পেট ও উরুর পেশি সবল হয়।
১৫. মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে।
১৬. ভাবাবেগ, ভয়-ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়।
১৭. আসনকারীকে আস্তে আস্তে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে, ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন করে।
১৮. যোগীকে তাঁর যোগ সাধনায় মনোনিবেশের জন্য প্রস্তুত করে।

দলীয় কাজ : অর্ধকূর্মাসনের উপকারিতা লিখে পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দ : কূর্ম, শিথিল, অজীর্ণ, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিতম্ব, পাঁজর, প্রকোপ, যকৃৎ।

পাঠ ৮ ও ৯ : গরুড়াসনের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রভাব

গরুড়াসনের ধারণা ও পদ্ধতি

এই আসনে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয়। তাই এর নাম গরুড়াসন।

দুইপা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থানে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : গরুড়াসন অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

গরুড়াসন নিয়মিত অনুশীলন করলে–

১. পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

২. পায়ে বাত হতে পারে না।

৩. পায়ের পেশিতে খিল ধরতে পারে না।

৪. উরু, নিতম্ব, পেট আর হাতের উপরের দিক মজবুত হয়।

৫. নিতম্ব, হাঁটু আর গোড়ালির গাঁটের নমনীয়তা বাড়ে।

৬. কাঁধ শক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে তা ভালো হয়।

৭. বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা হয়।

৮. ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা সহজ হয়।

৯. দেহ লম্বা হয়।

১০. দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

১১. কিডনি ভালো থাকে।

দলীয় কাজ : গরুড়াসনের উপকারিতাগুলো লেখ।

হলাসনের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রভাব

হলাসনের ধারণা ও পদ্ধতি

'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হলের অর্থাৎ লাঙ্গলের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে।

পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু'পাশে রাখতে হবে। এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদুর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম

নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিনবার অনুশীলন করতে হবে। যাদের আমাশয়, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ আছে এবং যাদের প্লীহা, যকৃৎ অস্বাভাবিক বড় তাদের আসনটি করা উচিত নয়।

একক কাজ : হলাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

হলাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে–

১. মেরুদণ্ডকে সুস্থ ও নমনীয় করে তোলে।
২. মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে।
৩. মেরুদণ্ড সংলগ্ন স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়।
৪. কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়।
৫. প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৬. থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল প্রভৃতি গ্রন্থি সবল ও সক্রিয় হয়।
৭. পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে গড়ে তোলে।
৮. ডায়াবেটিস, বাত বা সায়টিকা কোনো দিন হতে পারে না।
৯. পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়।
১০. যাদের কাঁধ শক্ত হয়ে গেছে তাদের উপকার হয়।

নতুন শব্দ : হল, প্লীহা, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, কোষ্ঠবদ্ধতা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'যোগই হলো আধ্যাত্মিক কামধেনু'— কে বলেছেন?

ক. ব্যাসদেব   খ. ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ
গ. মহর্ষি পতঞ্জলি   ঘ. মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য

২। অস্তেয় অর্থ কী?

ক. সম্যক তৃপ্তি   খ. নিজেকে জানা
গ. একাগ্রতা   ঘ. চুরি না করা

৩। কোনটি ধ্যানের ভিত্তিস্বরূপ?

ক. নিয়ম   খ. আসন
গ. ধারণা   ঘ. প্রত্যাহার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ সহজ-সরল ও সদালাপী। সে কখনো কাউকে কটু কথা বলে না এবং অন্যের ক্ষতির চিন্তা করে না। এমনকি বিড়াল এসে টেবিলে রাখা তার গ্লাসের দুধটুকু পান করতে থাকলে সে রাগ করে না। বরং আদর করে বিড়ালটিকে বাকি দুধটুকু পান করায়।

৪। সৌরভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যমের কোনটি লক্ষণীয়?

ক. অস্তেয় খ. ব্রহ্মচর্য
গ. অহিংসা ঘ. অপরিগ্রহ

৫। যমের উক্ত গুণটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর দ্বারা–

i. আত্মোন্নয়ন ঘটে
ii. সমাজের শান্তি বজায় থাকে
iii. বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ক. যোগের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

খ. অষ্টাঙ্গযোগের একটি ধাপ ব্যাখ্যা করো।

গ. যোগাসনটিতে কী ত্রুটি রয়েছে তা নিরূপণ করো।

ঘ. মানসিক শান্তি এবং শারীরিক সুস্থতা আনয়নে চিত্রের আসনটির সঠিক অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ–বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম শব্দটির অর্থ, 'যা ধারণ করে'। ধৃ ধাতু + মন্ (প্রত্যয়) = ধর্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতিও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে। আর এজন্যই মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করা ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে।

ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মাচার, ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মানুষ্ঠান অনুকরণীয় উপাখ্যান প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকে। কাজেই আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। এই ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি। এ অধ্যায়ে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা, উপনিষদ থেকে একটি উপদেশমূলক উপাখ্যান ও তার শিক্ষা উপস্থাপন করব। একই সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ হিসেবে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- উপনিষদের একটি উপাখ্যান ও এর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- রামায়ণ-মহাভারতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা

মানুষ জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিতে সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের লব্ধজ্ঞান হাজার হাজার বৎসর ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। তারপর লিপি আবিষ্কারের পর ধীরে ধীরে এ সমস্ত জ্ঞান গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষের কল্যাণে ঐশ্বরিক তত্ত্ব, ইহলোক ও পরলোকের কথা, শ্রেয় ও প্রেয়র কথা, নানা আখ্যান ও উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-রাজবংশের কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নানা রহস্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ।

এর পূর্বে আমরা ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হয়েছি। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য জেনেছি। আমাদের সকলেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। যার মনুষ্যত্ব নেই, সে পশুর সমান। ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। জেগে ওঠে মানবিকতা ও পবিত্রতার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। এ কল্যাণবোধই ধর্ম। আমরা জানি, মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এ চারটিকে বলা হয়েছে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ–

'বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥' *(মনুসংহিতা, ২/১২)*

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে।

একক কাজ : ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কী কী? লেখো।

মনুসংহিতায় ধর্মের আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে :

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।'

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এ দশটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সবকিছুর মূলে ঈশ্বর। সুতরাং ধর্মের মূলও ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ভক্তি করা ধর্মের মূল কথা। ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলা সকলেরই কর্তব্য। যা ধর্মের বিপরীত তাই অধর্ম। যেমন চুরি না করা ধর্ম। সুতরাং চুরি করা অধর্ম। অতএব, চুরি করা উচিত নয়। কারণ এতে অধর্ম হয়। অধর্ম নৈতিকতা-বিরোধী। ধর্ম নৈতিক শিক্ষার সহায়ক।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছি, এ সমস্ত কিছুই ধর্মগ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মগ্রন্থে আছে বিভিন্ন কাহিনি বা উপকাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে

দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্ম কীভাবে পরাজিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে কী করলে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নৈতিক উন্নতি হবে। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে কীভাবে মানুষ নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমরা আমাদের জীবনকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলব। এভাবেই আমাদের সমাজ তথা জাতি ও দেশ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

একক কাজ : ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তা লেখো।

পাঠ ২ : উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আমরা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পরিচয় জেনেছি। এবার আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করব।

উপনিষদ

'বেদ' একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশি, যা দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা, সবই এই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। মনুসংহিতায় লিখিত হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্' অর্থাৎ 'বেদ ধর্মের মুল।'

বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। যেমন– (১) মন্ত্র বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ। এ রচনা সমষ্টিকে দুইটি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে: যথা (ক) কর্মকাণ্ড ও (খ) জ্ঞান কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, অনুষ্ঠান, আচার-নিয়ম পালনের নির্দেশনা। আর জ্ঞান কাণ্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। উপনিষদ এই জ্ঞান কাণ্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়। উপ-নি- √সদ্ যোগে ক্বিপ্=উপনিষদ্ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'উপ' অর্থ-সমীপে', নি' অর্থাৎ নিশ্চয়ের সাথে, √সদ্ অর্থাৎ বিনষ্ট করা, সুতরাং সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায় গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সাথে যে গুহ্যবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাই উপনিষদ। উপনিষদ সম্পর্কে অন্যরূপ ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যেমন– জনসাধারণ যেখানে চারদিকে (পরি) বসে (√সদ্) তাকে বলে পরিষদ; এভাবে লোকেরা যেখানে একসঙ্গে (সম্) বসে (√সদ্) তাকে বলে সংসদ। অনুরূপভাবে শিষ্যগণ গুরুর নিকট (উপ) গিয়ে যেখানে বসতেন (নি-√সদ্) মূলত সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ। কালক্রমে এসব বৈঠকে বা উপনিষদে যে বিদ্যার অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হতো তারও নাম হয় উপনিষদ। এরপর যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ হলো তার নামও হলো উপনিষদ।

উপনিষদের আরও একটি অর্থ হলো রহস্য। অতিশয় গভীর এবং দুর্জ্ঞেয় বলে এই উপনিষদ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় যত্রতত্র সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না তাই এর এক নাম রহস্য। এজন্য উপনিষদ ও রহস্য শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে পড়ে। জগতের সর্বকালের অধ্যাত্ম ভাবনার চরমরূপ এই উপনিষদ। প্রতিটি বেদের পৃথক পৃথক উপনিষদ বিদ্যমান। উপনিষদের সংখ্যা দুই শতাধিক। এর মধ্যে বারটি প্রসিদ্ধ উপনিষদ। সেগুলো হলো– ঐতরেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক, ঈশ, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। এর মধ্যে মাণ্ডুক্য ভিন্ন অন্যগুলো শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিধায় এগুলোকে প্রধান উপনিষদ বলা হয়।

একক কাজ : বেদ ও উপনিষদ সম্পর্কে তিনটি করে বাক্য লেখ।

পাঠ ৩ : উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা

আগেই বলেছি, বেদের দুটি কাণ্ড। যথা: কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত। কারও কারও মতে, বেদের শেষ লক্ষ্য বা শেষ প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত এতে সংগৃহীত, সেজন্য এটি বেদান্ত। ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার, এজন্য এর নাম বেদান্ত এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলে এর অপর নাম হয়েছে উপনিষদ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করে জ্ঞান ও মুক্তিকামী জীবকে পরমব্রহ্মের নিকটে নিয়ে যায়। পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধন বা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা রয়েছে এ উপনিষদ গ্রন্থসমূহে।

উপনিষদ বা বেদান্ত রহস্যাবৃত ব্রহ্মবিদ্যার শাস্ত্র। যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রের বাণী শ্রবণ ব্রতী হন, একমাত্র তাঁরাই বেদান্ত তত্ত্বকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন। উপনিষদগুলো সাধারণত ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ, তবে ঈশোপনিষদটি সংহিতার সঙ্গে যুক্ত। তাই এটিকে সংহিতোপনিষদ বলা হয়; আর অন্যগুলোকে বলা হয় ব্রহ্মোপনিষদ।

সাংসারিক জীবনের ধন, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহ এবং সম্পূর্ণ উদাসীন একশ্রেণির লোক জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণে উৎসুক হয়ে সংসার ত্যাগপূর্বক অরণ্যে বসে গভীর ধ্যান-ধারণা করতেন, তাঁদের চিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলোই উপনিষদে স্থান পেয়েছে। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁদের পাদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করতেন এবং নিজেরাও গুরুর নিকট লব্ধ জ্ঞানের ও সাধনার অনুশীলন করে এ চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধন করেন।

উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারো সাথে কারো কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারো ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। অতএব আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সকলকে নিজের মতো করে দেখা। আর এভাবেই

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি।

একক কাজ :	সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে উঠতে পারে তোমার ভাবনার আলোকে একটি পোস্টার তৈরি করো।

পাঠ ৪ : উপাখ্যান

আরুণি- শ্বেতকেতু সংবাদ

পুরাকালে আরুণি নামে মহাজ্ঞানী এক ঋষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। শ্বেতকেতুর যখন বারো বছর বয়স হলো তখন ঋষি আরুণি তাকে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। বারো বছর গুরুগৃহে থেকে শ্বেতকেতু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে অহংকারী, অবিনীত ও পণ্ডিত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন। পিতা তাকে বললেন, 'শ্বেতকেতু, তুমি ত মহামনা, পণ্ডিত হয়ে ফিরে এসেছ। কিন্তু তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, যাতে অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়?' শ্বেতকেতু বললেন, 'ভগবান, কি সেই উপদেশ?' পিতা বললেন, 'হে সৌম্য! একটি মৃৎপিণ্ডকে জানলেই সমস্ত মৃন্ময় বস্তু সম্পর্কে জানা যায়। কারণ একটা ঘট একটা সরা, ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকার মাত্র। ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করলে সবই মৃত্তিকা। অনুরূপ একটি সুবর্ণপিণ্ডকে জানলেই সকল সুবর্ণময় বস্তুকে জানা যায়। কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি সুবর্ণের বিকার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণই সত্য। এসবই মৃত্তিকার বা সুবর্ণের বিকার ছাড়া কিছুই নয়। মৃত্তিকা বা সুবর্ণই সত্য। তেমনি হে শ্বেতকেতু, সেই উপদেশ শ্রবণ করলে অশ্রুত বিষয় শোনা হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়।' শ্বেতকেতু বললেন, 'পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। যদি অবগত হতেন, তবে বললেন না কেন?

সুতরাং আপনি আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিন।' আরুণি বললেন, 'হে সৌম্য, তা-ই হোক।' আরুণি বলতে লাগলেন– শোন, এ জগৎ পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপেই বিদ্যমান ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, 'বহু স্যাম' অর্থাৎ বহু হব। তারপর তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। তেজ থেকে জল উৎপন্ন হলো। জল থেকে অন্ন সৃষ্টি হলো। এজন্যই যেখানে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বহু অন্ন জন্মে। অন্ন থেকে মন, জল থেকে প্রাণ এবং তেজ থেকে বাক্-এর উৎপত্তি। শ্বেতকেতু বললেন, 'আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন।' আরুণি বললেন, 'শোন, পুরুষ ষোলোকলা যুক্ত। পনেরো দিন ভোজন করো না, কিন্তু যতটা ইচ্ছা জল পান করো, কারণ প্রাণ জলময়। জলপান করলে প্রাণ বিয়োগ হয় না।'

শ্বেতকেতু পনেরো দিন ভোজন করলেন না। তারপর পিতার নিকট গিয়ে বললেন, 'পিতা, আমি কি বলব?' পিতা বললেন, 'ঋক্, যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চারণ করো।' শ্বেতকেতু বললেন, 'ঐ সব আমার মনে আসছে না।' আরুণি বললেন, 'সৌম্য পনের দিন অনাহারে থেকে তোমার ষোলোটি কলার মাত্র একটি কলা অবশিষ্ট আছে। এর দ্বারা বেদসমূহ বুঝতে পারছ না। তুমি আহার করো। পরে আমার কথা বুঝতে পারবে।'

শ্বেতকেতু ভোজন করে পিতার নিকট গেলেন। পিতা তাঁকে যা কিছু বললেন, তিনি সে সবই অনায়াসে বুঝলেন। তিনি বললেন, হে সৌম্য, জল ভিন্ন দেহের মূল কোথায়? জলরূপ অঙ্কুর দ্বারা কারণরূপ তেজকে অন্বেষণ কর। বিশ্ব চরাচর এ সবই সৎ থেকে উৎপন্ন, সৎ-এ আশ্রিত ও সৎ-এ লীন হয়। এই সৎ বস্তুই আত্মা।

শ্বেতকেতু বললেন, 'হে পিতা, বুঝতে পারলাম না।'

আরুণি বললেন, 'হে সৌম্য, এ আত্মাকে জানতে পারলেই ব্রহ্মকে জানা যায়। কারণ, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'– অর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্মময়।'

শ্বেতকেতু বললেন, 'তাহলে আপনি কে?'

আরুণি বললেন, 'ব্রহ্মাস্মি– অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম।'

শ্বেতকেতু– তাহলে, আমি কে?

১০১৮

আরুণি–'তত্ত্বমসি অর্থাৎ তুমিই সেই (ব্রহ্ম)।'

শ্বেতকেতু–যদি আমি, আপনি এবং জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় তাহলে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন? তখন আরুণি শ্বেতকেতুকে এক গ্লাস জলে এক চামচ লবণ রেখে পরের দিন আসতে বললেন। শ্বেতকেতু তাই করলেন। পরের দিন সকালে আরুণি শ্বেতকেতুকে বললেন, 'কাল যে লবণ রেখেছিলে, তা আনো' শ্বেতকেতু লবণ খুঁজে পেলেন না। আরুণি শ্বেতকেতুকে বললেন, গ্লাস থেকে জল পান কর। শ্বেতকেতু জলপান করলেন।

আরুণি বললেন, 'কী রকম?'

শ্বেতকেতু বললেন, 'লবণাক্ত।'

আরুণি বললেন, 'হে শ্বেতকেতু, লবণ জলে লীন হয়ে আছে; তাই দেখা যায় না। কিন্তু সর্বদা জলের সর্বত্র বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম সর্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান, তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু জানা যায়। এ ব্রহ্মই জানার বিষয়। তিনিই সৎ, তিনিই আত্মা। আর এই ব্রহ্মকে জানা মানে আত্মাকে জানা, নিজেকে জানা। এটাই প্রকৃত জ্ঞান।'

উপাখ্যানের শিক্ষা

'জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়' উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে, সবকিছুকে ব্রহ্মজ্ঞান করা উপনিষদের শিক্ষা। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করেন। তাই কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই; কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে ব্রহ্মের ক্ষতি করা। সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

পাঠ ৫ : ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা

রামায়ণ আদি কবি বাল্মীকী মুনি রচিত। রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। রামায়ণ অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি ও উপাখ্যান। এ সকল আখ্যান ও উপাখ্যান আমাদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনি থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপ কার্য করে, সেটার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই তার ভাগীদার হবে না। দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণ করে একজন ঋষিতে পরিণত হন। শুধু উপদেশ প্রদানই নয়, গ্রহণ করার মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাহিনিটি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং আমাদের

উচিত সদা সৎপথে চলা, সত্য কথা বলা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, কাউকে দুঃখ না দেয়া। ধর্মগ্রন্থসমূহে মানুষের যাতে আত্মিক উন্নতি হয়, নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, এসব কথাই বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণে রয়েছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেশপ্রেমে নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য ও আনুগত্য প্রকাশ। যেমন– রাজা দশরথের সত্যরক্ষা করতে রামের রাজত্ব ত্যাগ ও চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন। রামের সাথে সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস গমন– পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বনবাসের কালে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ এবং রাম কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণ ও রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে উদ্ধার করা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং সত্যের জয়েরই প্রমাণ হয়েছে। মাতা কৈকেয়ীর আচরণে ভরত ক্ষুব্ধ হয়ে বড়ভাই রামকে ফিরিয়ে আনতে বনে গমন করেন। রাম ফিরে না এলে ভরত তার পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রামের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। ভরত রাজা হয়েও ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেননি। রাজসিংহাসনে বসেও বড় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে বনবাসীর মতো জীবনযাপন করেছেন। ভরত ও লক্ষ্মণের আচরণে আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের শিক্ষা লাভ করি।

রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে কেউ কখনো কোনোরূপ দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। এতে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা লাভ করে থাকি। রামের রাজত্ব সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, রামের মতো রাজা কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। তাই ধর্মাচরণের পাশাপাশি আমাদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ শ্রদ্ধাভরে পাঠ করা এবং রামায়ণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

পাঠ ৬ : ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা

মহাভারত অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন। মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কাশীরাম দাস বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন। মহাভারতের বিষয়বস্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি। কুরুক্ষেত্রে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে 'যথা-ধর্ম তথা-জয়'। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত হলেও এ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে নানা আখ্যান-উপাখ্যান। এ সমস্ত আখ্যান-উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে ধর্মের কথা। ধার্মিকের কথা, ধার্মিকগণের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর পরিণামে তাদের সার্বিক মঙ্গলের কথা। আর আছে অধর্মের কথা, অধার্মিকের কথা এবং পরিণামে তাদের পরাজয় ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। মহাভারতে এ রকম বহু কাহিনি উপকাহিনি রয়েছে। এ সমস্ত কাহিনি উপকাহিনি মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অধর্ম ও অন্যায় পথ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়।

মানুষের মনে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এ জন্য সকলেরই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে–'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' অর্থাৎ ভারতবর্ষে এমন কোনো ঘটনা নেই যা মহাভারতে বিবৃত হয়নি। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দম্ভ, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ে যেনতেন প্রকারে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করা এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে পরিহার করে অন্যকে তাঁর ন্যায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা। তাই আমরা দেখি মহাভারতে দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছে, পাণ্ডবগণ তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এতে প্রমাণ হয়েছে যাঁরা ধার্মিক ও ন্যায়ের পথে থাকে ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন। আর যাঁরা অধর্ম ও অন্যায়ভাবে অপরের বস্তু কেড়ে নিতে চায় ভগবান তাঁদের ক্ষমা করেন না। সাময়িকভাবে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি, ক্ষমতার দম্ভ দেখা গেলেও পরিণামে তাঁদের পতন অনিবার্য। মহাভারতে যে সমস্ত আখ্যান উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে হিংসার বিষময় ফল আর অহিংসার যে শুভ ফলপ্রাপ্তি তার প্রতিফলন ঘটেছে।

মহাভারত পাঠ করে আমরা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা গঠনে উদ্বুদ্ধ হই। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে তাঁর পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে মহামতি ব্যাসদেব এ মহাভারত বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নানা কাহিনি উপকাহিনি। এ সকল কাহিনির দ্বারা তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ, মানবিকতা, সকলই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে– রাজার কর্তব্য, প্রজাপালন, অতিথি সেবা, ক্ষমতার চেয়ে ভক্তির উৎকর্ষতার প্রমাণ। বারবার প্রমাণ হয়েছে– 'রাখে হরি মারে কে', অর্থাৎ হরি যাকে রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। তাই মহাভারত পাঠে আমরা ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হই, মানবিকতা ও নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করি, জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস পাই। সুতরাং আমাদের উচিত মহাভারত অধ্যয়ন করা এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করা।

নতুন শব্দ : শ্রেয়, প্রেয়, অনুশাসন, আত্মিক, সরা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ কোন বেদের অন্তর্গত?

ক. শুক্লযজুর্বেদ খ. কৃষ্ণযজুর্বেদ
গ. সামবেদ ঘ. ঋক্‌বেদ

২। শ্বেতকেতু কত বছর গুরুগৃহে ছিলেন?

ক. দশ খ. বার
গ. চৌদ্দ ঘ. ষোল

৩। রত্না শিক্ষকের উপদেশমতো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে এবং পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। রত্নার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে–

i. আনুগত্য

ii. উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা

iii. ভালো ফলের আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেয়সীর বাবা একজন শিল্পপতি। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক। তিনি সব সময় শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করেন এবং কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করেন। শ্রেয়সীও কখনও বাবার অবাধ্য হয় না। সে বাবার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত থাকে।

৪। শ্রেয়সীর চরিত্রে তোমার পঠিত কোন অবতারের আচরণের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

ক. শ্রীকৃষ্ণ খ. রামচন্দ্র

গ. শ্রীচৈতন্য ঘ. বলরাম

৫। শ্রেয়সীর আচরণে প্রকাশ পায়–

i. ভালোবাসা

ii. পিতৃভক্তি

iii. অনুকম্পা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অমিয় তার বন্ধুদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি শিশুদের একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে। আশ্রমের জন্য তাঁরা চাঁদা দেয়। কখনো বা প্রয়োজনে জোর করে চাঁদা তোলে কিংবা চুরি করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও টাকা সংগ্রহ করে। কারণ সে মনে করে, অনাথ শিশুগুলোকে বাঁচাতে হলে সব সময় ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে চলবে না। কিন্তু

অমিয়র বাবা বলেন, 'চুরি করা বা জোর করে চাঁদা আদায় উচিত নয়, সৎপথে উপার্জনের মাধ্যমেই ভালো কাজ করতে হয়'।

ক. কোন্ গ্রন্থ পাঠ করলে ধর্মের লক্ষণগুলো সম্বন্ধে জানা যায়?

খ. নৈতিকতা গঠনে উদ্দীপকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

খ. অমিয়র আচরণে ধর্মের যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'অমিয়র বাবার উপদেশ নৈতিকতা গঠনে একান্ত সহায়ক'– তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে কথাটি মূল্যায়ন করো।

২। মিতালীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দেখে শিক্ষক তাকে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। কিছু শিক্ষার্থী মিতালীকে সমর্থন জানালে তাদের সহযোগিতায় মিতালী যোগ্যতার সাথে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে। এতে শিক্ষক এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীই খুশি। কিন্তু প্রিতম ও কিছু শিক্ষার্থী এটা মেনে নিতে না পারায় তাদের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা হয়। তারা মিতালীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে শিক্ষক মিতালীকে সরিয়ে প্রিতমকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে মিতালীকে দায়িত্ব ফিরিয়ে দেন এবং অভিযোগকারীদের সংশোধন হতে বলেন।

ক. কে বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন?

খ. মহাভারতে কুরু ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কেন বুঝিয়ে লেখো।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রিতমের আচরণিক বৈশিষ্ট্য তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তুর কোন চরিত্রের প্রতিফলন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অনুচ্ছেদের ঘটনায় বর্ণিত শিক্ষকের ভূমিকা তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তু শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন করো।

অষ্টম অধ্যায়
ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে কীভাবে নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জেনেছি। বর্তমান অধ্যায়ে ধর্মগ্রন্থে ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে জানব। ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের আখ্যান-উপাখ্যান ধর্মতত্ত্বের নানা বিষয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং উপাখ্যানগুলো নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং আমরা ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠ করব এবং নৈতিক শিক্ষা অর্জন করব। এ অধ্যায়ে ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব, মানবতা ও সৎসাহস নামক দুইটি নৈতিক বিষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা ও তার প্রতিফলনমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবতার ধারণাটির ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবতার দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণিত উপাখ্যানের শিক্ষা চিহ্নিত করতে পারব
- সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এ শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নৈতিক সাহস ধারণার ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৎ সাহসের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণিত উপাখ্যানের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব

অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর এ ধর্মের বিধি-বিধান রয়েছে ধর্মগ্রন্থে। আমরা জানি, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে রয়েছে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ। আর এ সকল উপদেশ মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে। আমরা যেমন ধর্মকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি ধর্মগ্রন্থকেও শ্রদ্ধা করি।

ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এতেই সমাজে হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি ইত্যাদি তিরোহিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষ ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয় এবং আগ্রহভরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বা শ্রবণ করে ধন্য হয়, সুতরাং মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানবের কল্যাণে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতেই ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে নানা উপাখ্যান। আমরা এসব ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠ করে নিজেকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব। আর আমরা সবাই যদি এ নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হই, তাহলে সমাজেও তার প্রভাব পড়বে।

একক কাজ : ধর্মগ্রন্থে কী থাকে? ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে কী হয়? এ বিষয়ে পোস্টার তৈরি করো।

পাঠ ২ : মানবতার ধারণা

মনু+ষ্ণ = মানব অর্থাৎ মানুষ। মানুষের সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, ইত্যাদি। এই প্রবৃত্তিগুলো থাকলে তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ পশু-পাখি, জীব-জন্তু, এমনকি ইতর প্রাণীর মধ্যেও এ প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে, যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। পাঠের প্রথমে যে সহজাত প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পশুর মধ্যেও আছে; তাই এগুলোকে পাশবিক আচরণও বলা যেতে পারে। সুতরাং শুধু পাশবিক আচরণ দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়।

একক কাজ : (ক) মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা বা সম্মান করে?
(খ) কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ, এরই নাম মানবতা। জীবসেবাও মানবতার অঙ্গ।

মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে নিজেকে সার্থক করেছে, করেছে মহান। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের

জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও অনেক মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রুগ্ণকে ঔষধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। আমরা আমাদের জীবনে মানবতার গুণগুলো অর্জন করব। আমরা প্রকৃত মানুষ হব।

দলীয় কাজ : মানবিক ও পাশবিক আচরণ বা গুণের তুলনা করে ছক তৈরি করো।

পাঠ ৩ : রন্তিবর্মার মানবতা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তার রাজ্যের প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না। ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছুই দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি, কেউ ইচ্ছা করে কিছু দেয়নি। উপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তাঁর উপবাস ভঙ্গ হবে। হঠাৎ তাঁর সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত; সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কতদিন কিছুই খায়নি। ভিক্ষুক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কদিন ধরে কিছুই খেতে পাইনি, দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন। আমার সাথে আমার কুকুরটিও না খেয়ে আছে।' 'ক্ষুধার্ত' লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। কুকুরটি ক্ষুধায় ধুঁকছে। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন, তার সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন।

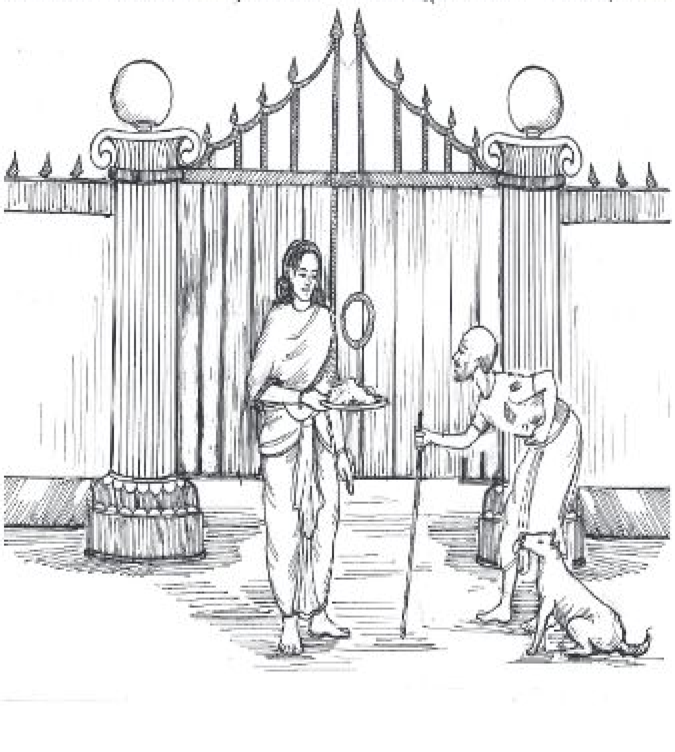

'পেট ভরল না', ভিক্ষুক জানাল। রাজা রন্তিবর্মা হাতজোড় করে বললেন, 'আর তো কিছুই নেই, ভাই।' এরই নাম মানবতাবোধ। নিজে আটচল্লিশ দিন অনাহারে থেকে প্রাণ ওষ্ঠাগত; তবু অপরের দুঃখে নিজের ভিক্ষালব্ধ খাবার

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দিয়ে নিজে কষ্ট সহ্য করা, এটা যে কত বড় মানবতা, তা যে কেউ অনুধাবন করতে পারেন।

উপাখ্যানের শিক্ষা : মানবতাই ধর্ম। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। আমরা মানবতা গুণ অর্জন করব। তাহলে নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে।

একক কাজ : উপাখ্যানটি পড়ে তোমরা কী শিক্ষা পেলে? এ সম্পর্কে খাতায় লেখ।

পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসাহসের ধারণা

'সাহস' কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তিদ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে 'সৎ সাহস'। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। যারা ভীরু-কাপুরুষ, তারা কখনো কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের জঞ্জালস্বরূপ। আর সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তাঁরা সমাজের, দেশের বা জাতির যে কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ।

ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেক বীরের কাহিনি আছে, যাঁরা তাদের সৎসাহসের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন।

একক কাজ : সৎসাহস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

সৎসাহসী বালক তরণীসেন

ত্রেতা যুগের কথা। অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন রানি– কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম সকলের বড়। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। পুত্রদের মধ্যে রাম সকলের বড়। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম পিতৃসত্য পালন করতে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। তাঁর সাথে বনে যান স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ।

বনবাসকালে রাক্ষস রাজা রাবণ সীতাকে একা পেয়ে হরণ করে লঙ্কায় এনে অশোক বনে বন্দি করে রাখেন। রাম সীতাকে উদ্ধার করতে সাগরে সেতু বন্ধন করে বানর বাহিনী নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করেন। রাবণের ভাই বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করেন রামের সাথে যুদ্ধ না করে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করার জন্য। কিন্তু দুষ্টমতি লঙ্কাপতি বিভীষণের কথায় কান না দিয়ে তাকে অপমান

করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দেন। বিভীষণ রামের আশ্রয়ে চলে আসেন এবং রামের পক্ষে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন।

রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনীর বড় বড় বীর যোদ্ধারা সব প্রাণ ত্যাগ করল। রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সোয়া লক্ষ নাতি ছিল। সকলেই এ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয়েছে শ্মশানে। রাবণ বিমর্ষ হয়ে রাজসভায় বসে প্রমাদ গুনছেন। এখন কী করা যায়? যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য এমন কেউ নেই যে, যুদ্ধ করে লঙ্কাকে রক্ষা করে।

বিভীষণ লঙ্কাপুরী ত্যাগ করলেও তার স্ত্রী সরমা ও পুত্র তরণীসেন লঙ্কা পুরীতেই অবস্থান করছিলেন। তরণীসেন তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। তরণীসেনের কাছে সংবাদ গেল যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনীর পরাজয়ের কথা, লঙ্কার বীরদের আত্মত্যাগের কথা। সে তখন রাবণের দরবারে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করে। রাবণ বালক তরণীকে কোনোমতেই এ ভয়ংকর যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিতে চাইলেন না। কিন্তু তরণীসেন রাবণকে রাজি করিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করল।

তরণী ছিল পিতা বিভীষণের মতোই ধার্মিক। সে তার রথের চূড়া রামনাম খচিত পতাকায় শোভিত করল। নিজের সারা অঙ্গে রামনাম লিখে নামাবলি গায়ে দিয়ে রথে উঠে বসল। রথ ছুটে চলল যুদ্ধের ময়দানে। রাম তাকিয়ে দেখেন রামনাম খচিত ধ্বজাধারী রথের উপর দ্বাদশ বর্ষীয় বালক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। রাবণের এহেন বিবেচনা দেখে রাম বিস্মিত হলেন। তার গায়ে রাম নামের নামাবলি জড়ানো।

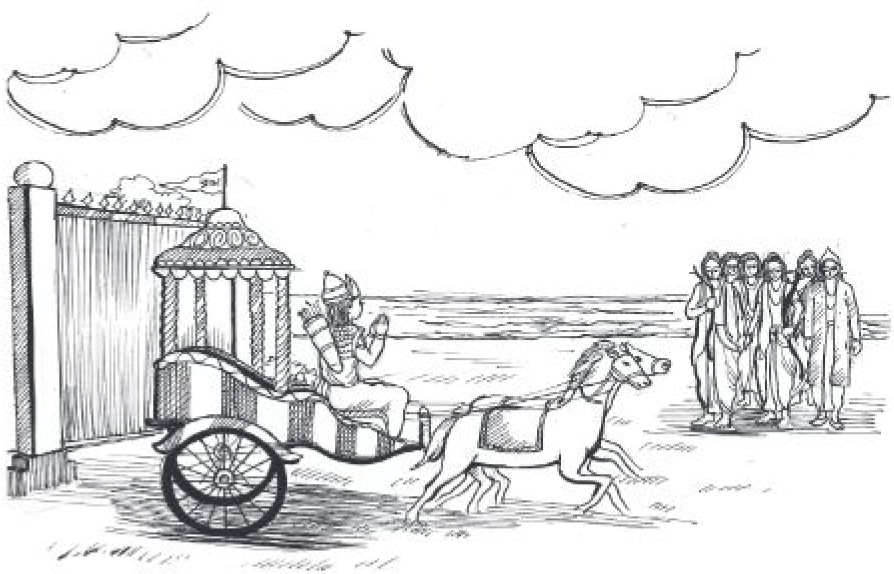

তরণী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে জয়রাম বলে ধ্বনি করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। অনেক বানর সৈন্য হতাহত হলো। রাম বালক বিবেচনায় এবং তার মুখে রাম নামের ধ্বনি শ্রবণ করে তার প্রতি বাণ নিক্ষেপ না করে বিভীষণকে বললেন, 'ওহে মিত্র বিভীষণ! কে এই বালক? সর্বদা মুখে রাম নাম জপ করছে। আমি কি করে এর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করি?'

তখন বিভীষণ তরণীর আসল পরিচয় রামকে বললেন না। বিভীষণ বললেন, 'এ দুরন্ত রাক্ষস। হে প্রভু রাম, এ রাক্ষসের প্রতি তুমি বৈষ্ণব অস্ত্র নিক্ষেপ করো। তাহলেই এ রাক্ষসের মৃত্যু হবে।'

রাম ধনুতে বৈষ্ণব অস্ত্র যোজনা করলেন। তরণীসেনকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন রামচন্দ্র। বাণ তরণীর বক্ষে বিদ্ধ হলো। তরণী 'জয়রাম, জয়রাম' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিভীষণ তরণীর প্রাণহীন দেহ কোলে তুলে 'হা পুত্র তরণীসেন', বলে কেঁদে উঠলেন। এতক্ষণে রাম বুঝতে পারলেন এ বীর বালক আর কেউ নয়, মিত্র বিভীষণের পুত্র তরণীসেন। রাম মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করলেন। শেষে তরণীর মস্তকে হস্ত রেখে রাম তাকে আশীর্বাদ করলেন। তরণী রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেল।

উপাখ্যানের শিক্ষা

স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হব। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কখনো পিছপা হব না।

দলীয় কাজ : তরণীসেনের আদর্শ সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করো।

নতুন শব্দ : অযাচক, দ্বাদশ বর্ষীয়, ধনুর্বাণ, বৈকুণ্ঠ, দিব্যদেহ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রামায়ণে কোন যুগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?

ক. সত্য খ. দ্বাপর
গ. ত্রেতা ঘ. কলি

২। তোমার পঠিত উপাখ্যানে তরণীসেনের চরিত্রে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

i. আত্মত্যাগ
ii. দেশপ্রেম
iii. নির্বুদ্ধিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রামতনু টেলিভিশনের খবরে জানতে পারেন তাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা বন্যাকবলিত। প্রবল স্রোত ও দুর্যোগের কারণে উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীদের উদ্ধার করা বা সাহায্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তারা জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। রামতনু তখনই একটি নৌকা নিয়ে তাদের উদ্ধার করতে যায় এবং সাধ্যমতো উদ্ধারে ব্রতী হয়।

৩। অনুচ্ছেদে রামতনুর বন্যাকবলিতদের উদ্ধার করার কাজটি হলো–

i. কর্তব্যনিষ্ঠা
ii. জীবসেবা
iii. সৎসাহস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। কোন মূল্যবোধটি রামতনুকে বন্যার্তদের উদ্ধার করার কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ করে?

ক. মানবতাবোধ খ. দয়া
গ. সহিষ্ণুতা ঘ. ক্ষমা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পৃথাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। একদিন পৃথা মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবে বলে বের হয়ে পথের ধারে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। পৃথার মা তাকে ভিক্ষা দিলেন। তা দেখে আরো কয়েকজন ভিক্ষুক এগিয়ে এলো। সবাইকে ভিক্ষা দেওয়ার পর মা দেখলেন তাদের কাছে রিকশা ভাড়ার আর কোনো টাকা নেই। তখন তারা পায়ে হেঁটেই আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছালেন। এতে একটু কষ্ট হলেও এবং সময় বেশি লাগলেও তাদের মন মানুষের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে ভরে গেল।

ক. রাজা রন্তিবর্মা কোন্ দেবতার ভক্ত ছিলেন?
খ. সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন বুঝিয়ে লেখ।
গ. রন্তিবর্মার আচরণের যে দিকটি পৃথার মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. পৃথা ও তার মায়ের অনুভূতি যেন রন্তিবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন– বিশ্লেষণ করো।

নবম অধ্যায়

ধর্মপথ ও আদর্শ জীবন

ধর্মপথ হচ্ছে ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ, অহিংসা এবং কল্যাণের পথ। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ।' নিজের চিরমুক্তি, আর জগতের হিত অর্থাৎ কল্যাণসাধনের জন্য। জীবনের যে পথ অনুসরণ করলে নিজের মোক্ষ বা চিরমুক্তি ঘটে এবং সকলের কল্যাণ হয়, সে পথই ধর্মপথ।

ধর্মপথের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক রয়েছে। যা নৈতিক তা ধর্ম, যা অনৈতিক তা অধর্ম। যিনি ধর্মপথে চলেন, তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক পান স্বর্গ ও মোক্ষ। অধার্মিক পান নরক যন্ত্রণা। বারবার জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কষ্ট। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে এবং ধর্মেরই জয় হয়। ধর্মগ্রন্থে অনেক উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও এ কথা বলা হয়েছে।

ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সততা ও শিষ্টাচার অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা প্রকাশের অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রণাম ও নমস্কার। আমরা জানি মাদকাসক্তি বা মাদক গ্রহণ সুস্থ জীবনের পরিপন্থি এবং এ পথ অধর্মের পথ। ধূমপান ও মাদকগ্রহণে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হয়। ধর্মপথে চললে মাদকাসক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমরা ধর্মপথে চলব এবং অধর্মের পথ পরিহার করব। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ধর্মপথের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধার্মিকের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারব
- ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে এবং ধার্মিকের জয় হয়–একথার ভিত্তিতে একটি ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মপথ অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে 'সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা'–এ কথা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব

- শিষ্টাচারের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রণাম ও নমস্কারের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ–এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধূমপান ও মাদকের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ধর্মপথে চলতে উদ্বুদ্ধ হব, জীবনাচরণে সততা ও শিষ্টাচার প্রদর্শনে আগ্রহী এবং মাদক প্রতিরোধে সচেতন হব।

পাঠ ১ : ধর্মপথের ধারণা

ধর্মপথ হচ্ছে ন্যায়ের পথ। সত্যের পথ, অহিংসা এবং কল্যাণের পথ। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আমরা ধর্ম পালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা জানি, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

এ মোক্ষলাভের জন্য কেবল ব্যক্তিগতভাবে সাধনা করলেই চলবে না। তাতে মোক্ষলাভ হবে না। পাশাপাশি জীবনের কল্যাণ সাধন করতে হবে। কারণ জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বা পরমাত্মা অবস্থান করেন। তাই জীব-জগতের কল্যাণসাধনও হিন্দুধর্মাদর্শের একটি প্রধান ভিত্তি।

সহজ কথায়, যে পথে চললে নিজের মোক্ষলাভ এবং জীব ও জগতের কল্যাণ সাধন হয়, সেই পথই ধর্মপথ।

ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের সঙ্গেও আমরা পরিচিত।
ধর্মের এ লক্ষণগুলো অনুসরণ করে জীবনযাপনের যে পথ তাকেই বলে ধর্মপথ।

বেদ

কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করার জন্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

স্মৃতি

ধর্মাধর্ম নির্ণয় বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান। বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে স্মৃতিশাস্ত্রগুলো দ্বিতীয় প্রমাণ।

সদাচার

কোন বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

বিবেক

অনেক সময় ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তখন বিবেকের বাণী গ্রহণ করতে হয়। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের বিবেককেও প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। বিবেক কী বলে? যে কাজ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে এবং সামষ্টিক অমঙ্গল ডেকে আনে, বিবেক সে-কাজকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে। কাজেই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে নির্ণয় করতে হবে : কাজটি করলে ধর্ম হবে, না অধর্ম হবে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিকর কাজ ধর্মসম্মত নয়। বিবেক সেখানে বাধা দেবেই।

সুতরাং ধর্মপথ বলতে বোঝায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বিচারে ন্যায় ও সত্যের পথ এবং ধৃতি, ক্ষমা, আত্মসংযম, অক্রোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলির প্রতিফলনমূলক পথ।

একক কাজ : ধর্মপথ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : আত্মমোক্ষায়, জগদ্ধিতায়, ব্রহ্মলগ্ন, স্মৃতিশাস্ত্র।

পাঠ ২ : নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের সম্পর্ক

আমরা জানি, কোনটা ভালো কাজ বা কল্যাণকর কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ, অকল্যাণকর কাজ, তা বিচার করার যে বোধ বা বিবেচনা শক্তি, তাকেই বলে নৈতিক মূল্যবোধ। আবার ভালো কাজ করা ধর্ম এবং মন্দ কাজ করা অধর্ম। অন্য কথায়, নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে, যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ :
পরের দ্রব্য অপহরণ করা বা আত্মসাৎ করা নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অন্যায় এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে পরের দ্রব্য অপহরণ করা অধর্ম। অধর্ম করলে পাপ হয়। পাপ করলে ইহলোকে শাস্তি ভোগ করতে হয় এবং পরলোকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ আর ধর্মানুমোদিত আচরণ করার অনুশাসনের উদ্দেশ্য একই।

নৈতিক মূল্যবোধ বলে : রাগ করবে না।

ধর্মীয় অনুশাসনও বলে : রাগ করবে না।

নৈতিকতা ধার্মিকের গুণ। যাঁর নৈতিকতা নেই তিনি অধার্মিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ ধর্মপথের নির্দেশ দেয়। যিনি সে নির্দেশ মেনে ধর্মপথে চলেন, তিনি ধার্মিক বলে বিবেচিত হন। যিনি তা করেন না, তিনি অধার্মিক বলে গণ্য হন।

> **দলীয় কাজ :** দলে আলোচনা করে মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথ সম্পর্কে দশটি বাক্য রচনা করো।

পাঠ ৩ : ধার্মিকের স্বরূপ

ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ প্রভৃতি) যাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন, তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কেবলই পরিতৃপ্ত হতে চায়। কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা তখন ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপথগামী হই। কিন্তু যিনি ধার্মিক, তিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছায় চলেন না। বরং ইন্দ্রিয়কেই সংযত করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে চালাতে পারেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন। তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্য শক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী এবং বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনো সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না, দুঃখে ভেঙে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ।

হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক প্রত্যয় হচ্ছে : জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বাস করেন। 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'– জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ধার্মিক ব্যক্তি শঙ্করাচার্যের এ বাণী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি গভীর জ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম এবং অকুণ্ঠ ভগবদ্‌ভক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধে পরিণত করেছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বিনয়ী। তিনি নিজেকে তৃণের চেয়েও নীচু মনে করেন। তিনি বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হন। তিনি সমদর্শী। তাঁর কাছে বর্ণভেদ নেই। জাতিভেদ নেই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তিনি সমান বিবেচনা করেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন। তিনি যোগযুক্ত হয়ে জগতের হিতসাধনে আত্মনিবেদন করেন। জীবপ্রেম বা জীবসেবাকে পরম কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মপথ অনুসরণ করে আদর্শ জীবনযাপন করেন। ধার্মিকের এ জীবনবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ যাঁর নেই, তিনি অধার্মিক।

> **একক কাজ :** ধার্মিকের পাঁচটি গুণ চিহ্নিত করো।

পাঠ ৪ : ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিণতি

ধার্মিক সদা সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সদানন্দ, সদা হাস্যময়, সদা প্রফুল্ল। প্রাপ্তি তাঁকে অহংকারী করে না, অপ্রাপ্তি তাঁকে বিষণ্ন করে না। তিনি তাঁর কর্মকে ঈশ্বরের কর্ম বলে বিবেচনা করেন এবং সকল কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগ করে আনন্দ পান। সেবা করে তৃপ্ত হন। তাঁর কর্ম জ্ঞান দ্বারা পরিস্রুত এবং ভক্তি দ্বারা বিশোধিত।

ধর্মগ্রন্থে আছে, ধার্মিক ইহলোকে শান্তি পান এবং পরলোকে তাঁর স্বর্গ লাভ হয়। ধার্মিক ধর্মকর্মের মাধ্যমে চরম অবস্থায় ব্রহ্ম লাভ করেন, তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় এবং ধার্মিক মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করেন।

অন্যদিকে অধার্মিক সবসময় অতৃপ্ত থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ন থাকেন। কাম তাঁকে তাড়িত করে, ক্রোধ তাঁকে উত্তেজিত করে, লোভ তাঁকে আকর্ষণ করে তাঁর অধঃপতন ঘটায়।

ইহলোকে তিনি কুকর্মে লিপ্ত থাকেন। কখনও কখনও কৃত কু-কর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ডভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কুকর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাঁকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।

তবে অধর্মের পথ পরিহার করে ধর্মপথে চললে পাপীও পরিশুদ্ধ হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। লাভ করতে পারে পরম করুণাময় ভগবানের করুণা।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন। ধর্মের জয় হয়। অধর্মের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান। ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মের জয় সম্পর্কে আমরা একটি উপাখ্যান জানব।

দলীয় কাজ : আলোচনা করে ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিণতি সম্পর্কে দশটি বাক্য রচনা কর।

পাঠ ৫ : উপাখ্যান

ধর্মের জয়

অনেক অনেককাল আগের কথা। তখন ছিল সত্যযুগ।

দৈত্যদের রাজা হিরণ্যকশিপু।

দৈত্য আর দেবতাদের মধ্যে চিরকালের ঝগড়া। হিরণ্যকশিপুও তার ব্যতিক্রম হবেন কেন? তিনিও ছিলেন হরিবিদ্বেষী। কিন্তু দৈত্যকুলে জন্ম নিয়েছিলেন এক হরিভক্ত। তিনি রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র। নাম প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদকে গুরুর কাছে অন্য বালকদের সাথে পাঠ গ্রহণ করতে পাঠানো হলো। কিন্তু পাঠে মন নেই প্রহ্লাদের। সেখানে তাঁর হরিভক্ত হৃদয় তৃপ্তি পাচ্ছে না।

একদিন রাজা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন–

–বৎস প্রহ্লাদ, কোন বস্তু তোমার সবচেয়ে প্রিয় বল তো?

– পার্থিব কোনো জিনিসই আমার প্রিয় নয়, বাবা। নিবিড় বনে গিয়ে শান্ত হৃদয়ে শ্রীহরির আশ্রয় নেয়াতেই আমার আনন্দ।

অবাক হয়ে গেলেন রাজা হিরণ্যকশিপু। কে তার ছেলের কানে এই হরিনাম দিয়েছে? শিশুদের বুদ্ধি এভাবেই পরের বুদ্ধিতে নষ্ট হয়।

–প্রহ্লাদকে আবার গুরুগৃহে পাঠাও, তার সুশিক্ষার জন্য যত্ন নাও– বললেন রাজা।

কিন্তু শত চেষ্টাতেও প্রহ্লাদের কোনো পরিবর্তন হলো না। তখন রাজা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজার আদেশ পেয়ে হুংকার দিয়ে এগিয়ে এলো দৈত্যেরা। ভয়ংকর তাদের চেহারা। হাতে তীক্ষ্ণ শূল। যার অগ্রভাগে মৃত্যুর আমন্ত্রণ। বলশালী অসুরেরা বালক প্রহ্লাদের কুসুমকোমল বক্ষ লক্ষ করে নিক্ষেপ করল শূল। কিন্তু হরিনামে পবিত্র বক্ষে সেই শূল বিদ্ধ হলো না।

প্রহ্লাদকে দেওয়া হলো বিষমিশ্রিত অন্ন। দেওয়া হলো হাতির পায়ের নিচে। তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে। সুউচ্চ পর্বত থেকে তাঁকে ছুড়ে ফেলা হলো কল্লোলিত মহাসমুদ্রে।

–কি হলো?– জিজ্ঞেস করলেন রাজা হিরণ্যকশিপু।

–প্রহ্লাদকে কোনোভাবেই হত্যা করা যাচ্ছে না, মহারাজ। – বলল ঘাতকেরা।

মহাক্রোধে আরক্তচক্ষু হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য ছুটে গেলেন।

– রে দুর্বিনীত, তুই কার বলে আমার শত্রুর পূজা করছিস? উপেক্ষা করছিস আমার আদেশ?

– ধর্মের বলে, বাবা। যাকে তুমি শত্রু বলছ তিনি শত্রু নন, বাবা। তিনি সকলের বন্ধু, সকলের প্রাণ, সকলের ত্রাণকারী প্রভু। তিনি সর্বত্র আছেন। সর্বত্র থাকেন। সর্বত্র থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেন।

– সর্বত্র থাকেন? – ক্রোধে জ্বলে উঠলেন হিরণ্যকশিপু।

– আছে? এই স্ফটিক স্তম্ভে তোর হরি আছে?

– আছেন, বাবা। – প্রহ্লাদের বিনীত উত্তর।

– তাই নাকি। – সিংহাসন থেকে উঠে দ্রুতবেগে স্তম্ভের দিকে ধেয়ে গেলেন হিরণ্যকশিপু। মুষ্টির আঘাত করলেন স্তম্ভের উপরে।

ভীষণ শব্দ হলো সেই স্তম্ভে।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত হলো সেই মহাশব্দে। দেবগণ পর্যন্ত ভীত হলেন সেই শব্দ শুনে।

হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিলেন, কোনো দেব, নর, যক্ষ প্রভৃতি কেউ কোনো অস্ত্র দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য বা পাতালে কোনো স্থানে, দিনে বা রাতে তাঁকে হত্যা করতে পারবে না।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ভগবান শ্রীহরি বেরিয়ে এলেন নৃসিংহ মূর্তিতে। বসে আছেন তিনি ভাঙা স্তম্ভকেই আসন বানিয়ে। হিরণ্যকশিপু তাঁকে খড়গ দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। তখন নৃসিংহ অবতাররূপী শ্রীহরি হুংকার ছেড়ে হিরণ্যকশিপুকে ধরে কোলের উপর ফেলে নখ দিয়ে হত্যা করলেন।

শ্রীহরি প্রহ্লাদকে দেখা দিলেন। প্রহ্লাদ তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিল শ্রীহরির প্রতি অবিচল ভক্তি। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মই প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিল। ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

একক কাজ : বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদকে তাঁর পিতা শাস্তি দেওয়ার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

একক কাজ : ধর্মের জয় উপাখ্যান থেকে কী শিক্ষা পেলে? লেখ।

নতুন শব্দ : সত্যযুগ, হিরণ্যকশিপু, দৈত্যকুল, পার্থিব, শূল, প্রকোষ্ঠ, আরক্তচক্ষু, দুর্বিনীত, অবশ্যম্ভাবী।

পাঠ ৬ : ধর্মপথ ও পারিবারিক জীবন

মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করে। আর আমরা তো জানি পরিবারের সকল সদস্যের স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা থাকে। তাই ধর্মপথ অনুসরণ তথা অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারে বড়দের কাছ থেকে ছোটরা আচার-আচরণ শেখে। পরিবারের ছোটরা বড়দের অনুসরণ ও অনুকরণ করে। তাই পরিবারে ধর্মপথ অনুশীলন-অনুসরণের চর্চা থাকা চাই। পরিবারে যদি সর্বদা সত্য কথার চর্চা হয়, কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় না নেয়, তাহলে সে পরিবারের কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেবে না।

পরিবারে যদি আত্মসংযম শেখানো হয়, লোভকে দমন করার দৃষ্টান্ত থাকে, তাহলে সে পরিবারের কেউ লোভী হবে না। যে পরিবারের ধর্মাদর্শ 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'– এ অক্রোধের চেতনা, সে পরিবারে শান্তি বিরাজ করবেই। সহমর্মিতা ও পরমতসহিষ্ণুতা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় নৈতিক মূল্যবোধ। এর অভাবে গণতন্ত্র ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

পরিবারে কেউ যদি নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়, তাহলে পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ সে পরিবারে থাকতে পারে না। ওই পরিবারের সদস্যরা সমাজেও গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখান না। অতি আদরের শিশু-কিশোর সদস্যরা মা-বাবাকে নিজের মতো অনুসারে কাজ করতে বাধ্য করে। যখন যা চাইবে, তা দিতে হবে। এ মানসিকতা নিয়ে সে যখন সমাজ-জীবনে আচরণ করতে যায়, তখন সে পরমতসহিষ্ণুতা তো দেখায়ই না, বরং নিজের মত জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যরা সততা, সত্যপ্রিয়তা, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতায় মণ্ডিত ধর্মপথ অনুসরণ করলে, পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকবে। আর প্রতিটি পরিবার যদি ধর্মপথে চলে, তাহলে সমাজও ধর্মপথে চলবে। সুতরাং ধর্মপথ অনুসরণ-অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দলীয় কাজ : ধর্মপথ অনুশীলনে পারিবারিক জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দশটি বাক্য লেখ এবং একটি উদাহরণ দাও।

পাঠ ৭ : সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা

মিথ্যার আশ্রয় নিলে তার ফল ভালো হয় না। তাই বলা হয়, 'সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা'। এ সম্পর্কে একটি উপাখ্যানের বিবরণ দেব।

গরিব কাঠুরিয়ার সততা

ছায়াসুনিবিড় ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের পাশে বন। আর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা নদী। ঐ গ্রামে বাস করতেন এক গরিব কাঠুরিয়া। পাশের বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করে সংসার চালাতেন তিনি।

একদিন তিনি বনে কাঠ কাটতে গেছেন। যে গাছের ডালটা তিনি কুঠার দিয়ে কাটছিলেন, সেটা নদীর ওপর দিয়ে নদীর দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

গাছের ডালটা কাটার সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। কাঠুরিয়ার অসতর্কতায় তাঁর কুঠারটা পড়ে গেল নদীতে। ঘরে খাবার নেই। কাঠ কেটে বিক্রি করবেন, তারপর চাল-ডাল সব কিনবেন, তবে পরিবারের সবাই মিলে খাবেন!

এখন যে সবাই মিলে উপোস করে থাকতে হবে! মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

কাঠুরিয়ার দুঃখে জলদেবীর দয়া হলো। তিনি নদীর ভেতর থেকে উপরে উঠে এলেন। শরীরের অর্ধেকটা জলে, অর্ধেকটা জলের উপরে।

–শোন কাঠুরিয়া।

ডাক শুনে নদীর দিকে তাকাতেই কাঠুরিয়া দেখেন, জলদেবী তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। মিটিমিটি হাসছেন। তাঁর হাতে রয়েছে একটি সোনার কুঠার।

জলদেবী কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন,

–এ কুঠারটাই তো তোমার, তাই না?

কাঠুরিয়া জলদেবীর হাতের কুঠারের দিকে তাকালেন। রোদের আলোয় ঝকমক করছে সোনার কুঠার। এ কুঠারটি তাঁর নিজের বলে নিয়ে নিতে পারেন তিনি। তাতে তাঁর দারিদ্র্য-দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। সোনালি সুখের আলোতে ভরে উঠবে তাঁদের জীবন, তাঁদের সংসার। কিন্তু তাতে ধর্ম নষ্ট হবে। অসৎ হয়ে যাবেন তিনি। এক মুহূর্তে সবটা ভেবে নিয়ে কাঠুরিয়া মাথা নেড়ে জলদেবীকে জানালেন,

–ওটা আমার কুঠার নয়।

–'তাই নাকি?'– হেসে বললেন জলদেবী।

–একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি।'

জলদেবী আবার ডুব দিলেন নদীর জলে। জল থেকে উঠে এসে এবার তিনি কাঠুরিয়াকে একটা রূপার কুঠার দেখালেন। এবারও কাঠুরিয়া জানালেন, ঐ কুঠারটিও তাঁর নয়।

জলদেবী কাঠুরিয়াকে অপেক্ষা করতে বলে আবার নদীর জলে ডুব দিলেন। এবার তিনি নিয়ে এলেন কাঠুরিয়ার নিজের লোহার কুঠার। কাঠুরিয়া সেই লোহার কুঠারটি দেখে বলে উঠলেন,

–হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আমার কুঠার।

জলদেবী মুগ্ধ হলেন দরিদ্র কাঠুরিয়ার সততায়। তিনি কাঠুরিয়াকে সোনা ও রূপার কুঠার দুটিও দিয়ে দিলেন।

কাঠুরিয়ার দারিদ্র্য দূর হলো। তাঁকে আর অতো কষ্ট করে কাঠ কাটতে হয় না। কুঁড়েঘরের জায়গায় দালান উঠল। বেশ কিছু জমিও কিনলেন তিনি।

তাই না দেখে গাঁয়ের মোড়ল অবাক হয়ে গেলেন। কেমন করে এত তাড়াতাড়ি দরিদ্র কাঠুরিয়া ধনী হয়ে গেল!
মোড়ল এলেন কাঠুরিয়ার বাড়ি।

কাঠুরিয়ার কাছে সব শুনলেন।

–'ও, তাহলে এই কথা! জলদেবীর কৃপায় ধনী! আচ্ছা।'–মনে মনে বললেন তিনি।

মোড়ল নদীর ধারে উপস্থিত হয়ে ইচ্ছে করে হাতের লোহার কুঠার নদীতে ফেলে দিয়ে হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে লাগলেন। তার কান্না শুনে জলদেবী নদীর ভেতর থেকে উঠে এলেন। বললেন, তোমার কী হয়েছে? মোড়ল কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার কুঠার নদীতে পড়ে গেছে। এখন যে সবাইকে উপোস করে থাকতে হবে। মনের দুঃখে সে আবার কাঁদতে শুরু করে। জলদেবী বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি। এরপর জলদেবী উঠে এলেন একটি সোনার কুঠার নিয়ে।

–এই কুঠার কি তোমার?

লোভে চকচক করে উঠল মোড়লের চোখ।

তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন,

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই আমার কুঠার।

জলদেবী খুব রেগে গেলেন। তিনি সোনার কুঠার নিয়ে ডুব দিলেন নদীর ভেতরে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

জলদেবী আর উঠলেন না।

মোড়ল বিরস বদনে, বিষণ্ন মনে ফিরে গেলেন তাঁর গাঁয়ে।

মিথ্যাচার নয়। সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা। একথা আমরা মনে রাখব এবং জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেব।

একক কাজ : কাঠুরিয়ার দারিদ্র্য দূর হলো কীভাবে? বোর্ডে লেখ।

পাঠ ৮ : শিষ্টাচার

শিষ্টাচারের ধারণা

সততার মতো শিষ্টাচারও আদর্শ জীবনের অঙ্গ। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শিষ্টাচার অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচারকে বলে শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ শিষ্টাচারের জন্যও মানুষ পশু-পাখি থেকে আলাদা।

ধর্মপথে চলার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার অন্যতম পাথেয়। প্রথমে পরিবারের কথাই ধরা যাক।

মাতা, পিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে আমরা প্রণাম জানাই। এই প্রণাম জানানোর মধ্য দিয়ে যে শিষ্টাচার প্রকাশ পায়, তার নাম ভক্তি বা শ্রদ্ধা।

আবার সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাই এবং ছোটদের স্নেহ করি। সবই শিষ্টাচারের রকমফের।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। দেব দেবীরা আমাদের নিজ নিজ শক্তি বা গুণ দিয়ে সহায়তা করেন।

তাই আমরা তাঁদের স্তব-স্তুতি করি, প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের প্রণাম জানাই। তাই ধর্মাচারের মধ্য দিয়েও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। শিষ্টাচার একটি নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মের অঙ্গ।

শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি। সমাজজীবনে চলার পথে শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় গুণ বা নৈতিক মূল্যবোধ।

কারও সঙ্গে দেখা হলে আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আমরা বড়দের প্রণাম করি বা নমস্কার জানাই। সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাই এবং ছোটদের আশীর্বাদ করি। এক্ষেত্রে প্রথাগত শিষ্টাচার হচ্ছে, বয়সে যে ছোট, সে প্রণাম বা নমস্কার জানাবে। বড়রা কল্যাণ হোক, দীর্ঘজীবী হও ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করবেন। এটাই রীতি।

প্রণাম বা নমস্কারের ধারণা

প্রণাম বলতে বোঝায় প্রকৃষ্টরূপে নমন বা নমস্কার। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় 'শব্দকোষ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্রণাম চার প্রকার:

১. অভিবাদন
২. পঞ্চাঙ্গ প্রণাম
৩. অষ্টাঙ্গ প্রণাম
৪. নমস্কার

অভিবাদন

বাক্য দ্বারা 'প্রণাম করি' বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়। অনেক সময় বাক্য উচ্চারণ না করে কেবল আনত হয়েও অভিবাদন জানানো হয়।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম

'তন্ত্রসার' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে–
বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বক্ষস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় যোগে অবনত হয়ে যে প্রণাম করা হয়, তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম

জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি– প্রণামের এ আটটি অঙ্গ। এ আটটি অঙ্গ ব্যবহার করে প্রণাম করলে তাকে অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

নমস্কার

নমস্কার প্রণামের প্রতিশব্দ । তবে এখানে নমস্কার হচ্ছে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকানো । নমস্কার তিন প্রকার । যথা– কায়িক, বাচিক ও মানসিক ।

নমস্কারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নৃসিংহ পুরাণে বলা হয়েছে–

> 'নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ ।
> নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পুতো হরিং ব্রজেৎ ॥'

অর্থাৎ নমস্কার সকল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান । একমাত্র নমস্কার দ্বারা মানব বিশুদ্ধ হয়ে হরিকে লাভ করে ।

একক কাজ : প্রণাম কত প্রকার ও কী কী? লেখ

আমরা পূজা করার সময় নির্দিষ্ট প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে দেব-দেবীদের প্রণাম জানাই । গুরুজনদের প্রণাম করি এবং নমস্কার জানাই ।

সাধু-সজ্জন-বৈষ্ণব-ভক্তেরা সবাইকে প্রণাম বা নমস্কার করেন । এর মধ্যে একটি ধর্মদর্শন রয়েছে । আসলে আমরা প্রণাম বা নমস্কার করছি কাকে?

হিন্দু ধর্মদর্শন অনুসারে এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– জীবের মধ্যে আত্মারূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অবস্থান করেন, সেই ব্রহ্মকে প্রণাম বা নমস্কার করছি ।

এ ধর্মদর্শনের কারণে সকলেই প্রণম্য । সুতরাং শিষ্টাচারের অঙ্গরূপে প্রণাম বা নমস্কারের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে ।

পাঠ ৯ : মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ

আমরা জানি মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক এবং অধর্মের পথ । কারণ মাদকাসক্তি মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয় । তিনি আর প্রকৃতিস্থ থাকেন না, সুস্থ থাকেন না । আর অসুস্থ দেহ ও মনে তিনি যে আচরণ করেন, তাতে অনৈতিকতা প্রকাশ পায় ।

ধূমপান, মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন, কোডিন (ফেনসিডিল) ইত্যাদি মাদক । এগুলো গ্রহণ করা একবার শুরু হলে তা নেশায় পরিণত হয় আর সহজে ছাড়া যায় না । মাদকাসক্ত মাদকদ্রব্য না পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন । তার আচরণ কখনও কখনও হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক ।

ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল

ধূমপান ও মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধন করে । ধূমপানের ফলে নানাবিধ রোগ হয় । যেমন– নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, হৃদরোগ ইত্যাদি । তাছাড়া ধূমপান শুধু ধূমপায়ীরই ক্ষতি করে না, অন্যদেরও ক্ষতির কারণ হয় ।

মাদকগ্রহণেও নানা প্রকার অসুখ হয় এবং মাদকাসক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যান। মাদকগ্রহণে মানসিক ক্ষতি হয়। মাদকাসক্ত অবস্থায় বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। মাদকাসক্তের চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কবিকৃতি পর্যন্ত ঘটতে পারে। মাদকদ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে মাদকাসক্ত অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না। মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন পর্যন্ত শিথিল হয়ে যায়।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন, সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে।

সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে– 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে আমরা এমন শিক্ষা পেতে চাই, যা পরিবারের সকল সদস্যকে ধূমপান ও মাদকগ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখে। পরিবারের সবাই যেন অঙ্গীকার করে–

> 'ধূমপান মাদকগ্রহণ অধর্মের পথ,
> চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।'

বাড়ির কাজ :

১. নিজের জীবন থেকে শিষ্টাচার প্রদর্শনের ঘটনা লিখে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

২. 'ধূমপান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা'–শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিরণ্যকশিপু রাজা ছিলেন–

ক. দৈত্যদের খ. দেবতাদের

গ. পশুদের ঘ. মানবকুলের

২। মানুষকে কেন নরক যন্ত্রণা ভোগের পর মানবেতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়?

ক. পাপ ক্ষয় হয় বলে

খ. পাপ নিঃশেষ হয় না বলে

গ. পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য

ঘ. পৃথিবীকে ভালোবাসার কারণে

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোদেলা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ছবি এঁকে শিক্ষককে দেখাবে বলে বেঞ্চের উপর রাখল। শিপ্রা হাতের ধাক্কায় 'ওয়াটার পট' উল্টে দিলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। পরের দিন সে আবার এঁকে আনলে শিপ্রা এবারও তা নষ্ট করার চেষ্টা করে। রোদেলা শিপ্রাকে এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে সে আঁকতে পারছে না। একথা শুনে রোদেলা তাকে আঁকতে সাহায্য করে।

৩। রোদেলার প্রতি শিপ্রার হিংসাত্মক আচরণের কারণ হলো –

i. অসহায়তা

ii. অপারগতা

iii. হীনম্মন্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। শিপ্রার দুষ্কর্মের প্রতিবাদ না করার মধ্য দিয়ে রোদেলার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক. ক্ষমা খ. বিদ্যানুরাগ

গ. হিংসা ঘ. অনীহা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দিব্যেন্দু ইতিহাসের অধ্যাপক। সকালে পূজাহ্নিক করে তিনি কর্মস্থলে বের হন। তিনি প্রতিদিন পশুপাখিদের খাবার দেন এবং দরিদ্র অসহায়দের প্রচুর দান-ধ্যান করেন। দিব্যেন্দু বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা করেন। সত্য ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও সত্য প্রচারে বিমুখ হন না এবং তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা না হলেও ভেঙ্গে পড়েন না। এ সকল কারণে তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হন।

ক. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা কোন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত?

খ. জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ – শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. দিব্যেন্দুর আচরণিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবার কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দিব্যেন্দুর দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, 'সৎকর্ম কখনও বিফলে যায় না' – পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন করো।

২। রিদিমা প্রতিদিন পূজা করার সময় প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানায়। পূজা শেষে বাবা-মাকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করে। গুরুজনদের প্রতিও সে শ্রদ্ধাশীল। সে কখনও কারো সাথে অসদাচরণ করে না এবং ছোট ভাইবোনদেরকেও অত্যন্ত আদর-যত্ন করে। তাই সে পরিবার ও প্রতিবেশীসহ সকলের কাছেই প্রিয়। মানুষের প্রতি রিদিমার এ আচরণ সমাজের মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেছে।

ক. তন্ত্রসার কী?

খ. আমরা দেবতাদের স্তব-স্তুতি করি কেন?

গ. বর্ণিত অনুচ্ছেদে রিদিমার চরিত্রে কোন শিক্ষার প্রতিফলন প্রতিভাত হয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'রিদিমার দৃষ্টান্তই স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম'– কথাটি মূল্যায়ন করো।

দশম অধ্যায়

অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত

অবতরণ করেন যিনি তিনিই অবতার। তবে ধর্মশাস্ত্রে যে-কাউকেই অবতার বলা হয়নি। ভগবান বিষ্ণু যখন জগতের কল্যাণের জন্য বিভিন্নরূপে বৈকুণ্ঠ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার। কাজ শেষ হলে তিনি আবার স্বস্থানে ফিরে যান। বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সে-সবের মধ্যে মৎস্যাদি দশ অবতার বিখ্যাত। এ সম্পর্কে আমরা নিচের ক্লাসে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা অবতারের ধরন এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে আবির্ভাবের কারণ জানতে পারব।

অবতার ছাড়াও যুগে-যুগে এমন কিছু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাণ করে গেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো চাওয়া-পাওয়া ছিল না। অকাতরে তাঁরা মানব কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে-সব মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনই আমাদের নিকট আদর্শ জীবনচরিত। নিচের ক্লাসে আমরা বেশ কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনী পড়েছি। এখানে আমরা আরো কয়েকজনের জীবনী পড়ব এবং তাঁদের জীবনী থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অবতারের ধারণা ও এর ধরন (পূর্ণাবতার ও অংশাবতার) ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানে চরক ও সুশ্রুতের অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে শ্রীশঙ্করাচার্যের মতাদর্শ ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে মীরাবাঈ, প্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীমার মতাদর্শ শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শ শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠনে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।

পাঠ ১ : অবতার

আগেই বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার । অবতাররূপে তিনি জগতের কল্যাণ করেন । পৃথিবী সব সময় এক রকম থাকে না । পৃথিবীতে নানা সময়ে নানা দুষ্ট লোকের জন্ম হয় । তারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে । এতে জগতে শোক, দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হয় । শিষ্টদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে । এমনি সময়েই ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে আবির্ভূত হন । দুষ্টদের বিনাশ করেন । জগতে আবার শান্তি ফিরে আসে । ভগবানও তাঁর স্বস্থানে ফিরে যান ।

ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবের রূপ ধরে অবতরণ করেন । তিনি যখন মানুষরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি মানুষের মতোই আচরণ করেন । মানুষের মতোই মাতৃগর্ভে জন্ম নেন । মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ ভোগ করেন । তবে তার মধ্য দিয়েও তাঁর কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে । যেহেতু তিনি ভগবান । ভগবান ও মানুষ কখনো এক হতে পারে না ।

অবতারের ধরন

অবতার দুই রকমের–পূর্ণাবতার ও অংশাবতার । ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার । ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ পূর্ণাবতারের মধ্যে থাকে । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার । কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে ছিল ।

ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে বলা হয় অংশাবতার । অংশাবতারে ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ থাকে না । অংশাবতার অনেক । তার মধ্যে দশটি প্রধান, যেমন– মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি । এঁরা বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করেছেন । ভগবানের অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-কথা তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (৪/৭-৮)

হে অর্জুন, জগতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় এবং অধর্মের উত্থান ঘটে, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি । সজ্জনদের রক্ষার জন্য, দুর্জনদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মকে সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই । অর্থাৎ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন খুবই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন । এদের অত্যাচারে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল । শ্রীকৃষ্ণ এদের বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করেন ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন। দুষ্টের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর, সজ্জনের কাছে শান্তির সৌম্য কান্তিধারী, ভক্তের কাছে ভগবান।

আদর্শ জীবনচরিত

পাঠ ২ : সুশ্রুত

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি।

দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্তবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ-কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তাঁর নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য। সুশ্রুত দিবোদাসের নিকট আয়ুর্বেদ শিখে চিকিৎসা-সংক্রান্ত একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নাম অনুসারে গ্রন্থের নাম হয় 'সুশ্রুত' বা 'সুশ্রুতসংহিতা'।

আধুনিক গবেষকদের মতো সুশ্রুত খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি তাঁর গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। পাশ্চাত্যে এই অস্ত্রগুলোর আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

সুশ্রুতসংহিতা প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত – সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান এবং কল্পস্থান। এতে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, পীড়া, ঔষধ, অস্থি, চিকিৎসা, রোগের লক্ষণ, পথ্যাপথ্য ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করতে হলে সুশ্রুতসংহিতার বিশেষ জ্ঞান থাকতে হয়। বর্তমান কালেও চিকিৎসা জগতে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে সুশ্রুতসংহিতায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সুশ্রুতসংহিতা রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

পাঠ ৩ : চরক

চরকও ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাঁকে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়। তাঁর সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু যখন মৎস্যাবতাররূপে আবির্ভূত হন, তখন অনন্তদেব অথর্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ লাভ করেন। এরপর তিনি মানুষের অবস্থা দেখার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন। দেখেন, অনেকেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বেদনায় কাতর। তা দেখে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। তাই মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য তিনি একজন মুনিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। চররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন বলে তাঁর নাম হয় চরক। আধুনিক গবেষকদের মতে চরক খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে আবির্ভূত হন।

চরক মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পূর্বে আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রমুখ আরো চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা বৈদ্যক বা চিকিৎসা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। চরক সেসবের সংস্কার ও সারাংশ গ্রহণ করে একখানা নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার

নাম 'চরকসংহিতা'। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এটি একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি আটটি ভাগে বিভক্ত– সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান।

চরকই প্রথম মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো–বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন– রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

চরক প্রজনন বিদ্যা সম্পর্কে জানতেন। এমনকি শিশুর লিঙ্গ নির্ণয়ের কারণসমূহও তিনি জানতেন। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি মানবদেহে দাঁতসহ ৩৬০টি অস্থির কথা বলেছেন। হৃৎপিণ্ডকে বলেছেন দেহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৩টি পথে এ কেন্দ্র সমগ্র শরীরের সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমান কালেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এ গ্রন্থের গুরুত্ব অনেক। চরকসংহিতা রচনা করে চরক সমগ্র মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

সুশ্রুতসংহিতা এবং চরকসংহিতা উভয় গ্রন্থই ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আব্বাসীর সময় আরবি ভাষায় অনূদিত হয় এবং এর মাধ্যমে ইউরোপে প্রচারিত হয়। এর ফলে ইউরোপের অনেক চিকিৎসক ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

পাঠ ৪ ও ৫ : শ্রীশঙ্করাচার্য

দাক্ষিণাত্যের কেরল রাজ্যে কালাড়ি নামে এক গ্রাম। এই গ্রামে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম বিশিষ্টা দেবী। শিবগুরু ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং শিবভক্ত।

শঙ্করের ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তা দেখে পিতা শিবগুরু অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি তিন বছর বয়স থেকেই পুত্রকে পড়াতে শুরু করেন। তাঁর একান্ত বাসনা, পুত্রকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর পাঁচ বছর বয়সে বিশিষ্টা দেবী ছেলের উপনয়ন দেন। উপনয়নের পর শাস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হয়। সেখানে মাত্র দুই বছরের মধ্যে শঙ্কর বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সাত বছর বয়সে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন। স্থানীয় পণ্ডিতরা প্রথমে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগলেন। সাত বছরের বালক কী পড়াবে? কিন্তু ক্রমে শঙ্করের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সবাই তাঁর নিকট মাথা নত করেন।

শঙ্করের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানেও যায় এ কথা। তিনি মন্ত্রীকে পাঠান শঙ্করকে রাজসভায় নিয়ে যেতে। কিন্তু শঙ্কর বিনয়ের সঙ্গে বলেন, তিনি বিদ্যা নিয়ে ব্যবসা করতে চান না। লোকের মঙ্গলের জন্য তিনি বিদ্যা বিতরণ করবেন। বালক শঙ্করের এই তেজোদৃপ্ত কথা শুনে রাজা বিস্মিত হন। তিনি নিজে চলে আসেন শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে

কথা বলে রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বুঝতে পারেন। তাই রাজা হয়েও এই অসাধারণ বালক পণ্ডিতকে প্রণাম করে তিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। কিন্তু শঙ্কর তার একটিও স্পর্শ করেননি। সব দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।

শঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর বাড়িতে আসেন। তাঁরা শঙ্করের সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রালাপ করে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। একপর্যায়ে মা বিশিষ্টা দেবী পণ্ডিতদের অনুরোধ করেন শঙ্করের কোষ্ঠী দেখতে। পণ্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে বলেন, শঙ্করের আয়ু খুবই স্বল্প। ষোল অথবা বত্রিশ বছরে তাঁর মৃত্যুর যোগ আছে। এ-কথা শুনে বিশিষ্টা দেবী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর একমাত্র অবলম্বন শঙ্করকে এত অল্প বয়সে হারাতে হবে!

শঙ্করও এ কথা শুনলেন। তিনি মাকে খুব ভালোবাসতেন। টোলের ছাত্রদের পড়ানোর অবসরে যে সময়টুকু পেতেন, তখন তিনি কেবল মায়ের সেবা করতেন। কিন্তু মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি নতুন করে ভাবতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, মোক্ষলাভই মানুষের চরম লক্ষ্য। তাই ব্রহ্ম-সাধনায় তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন।

একদিন শঙ্কর মাকে তাঁর মনের কথা খুলে বলেন। কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হন না। অবশেষে শঙ্কর অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজি করালেন। তিনি এ-ও বললেন, যেখানেই থাকেন-না-কেন, মায়ের অন্তিম সময়ে তিনি পাশে উপস্থিত থাকবেন। এই বলে শঙ্কর একদিন গৃহত্যাগ করেন।

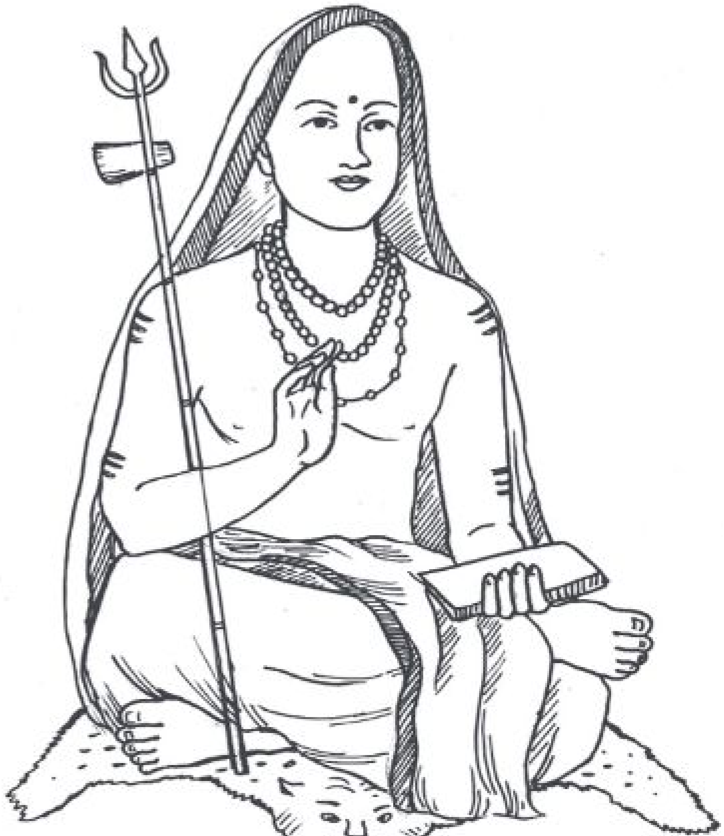

শঙ্কর সন্ন্যাস নেবেন। তাই গুরুর সন্ধান করছেন। দুই মাস ক্রমাগত পথ চলতে চলতে তিনি উপস্থিত হন ওঙ্কারনাথের দ্বীপশৈলে। সেখানে দেখা পান মহাযোগী গোবিন্দপাদের। তাঁর নিকট তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। তিন বছর গুরুর কাছে থেকে তিনি যোগসিদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করেন। তারপর গুরুর নির্দেশে চলে যান হিমালয়ের নিভৃত ধাম বদরিকা আশ্রমে। সেখানে তিনি বেদান্তভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায়

মনোনিবেশ করেন। ষোলো বছর বয়সের মধ্যেই তিনি গুরুর নির্দেশিত গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেন।

এর পর ধর্মগুরু হিসেবে শুরু হয় শঙ্করের নতুন জীবন। তাঁর অনেক শিষ্যও জুটে যায়। তিনি তখন আচার্য নামে খ্যাত। শঙ্করাচার্য। বদরিকাশ্রম থেকে তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন। সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করের এই মতবাদ প্রথমে অনেকেই মানতে চান নি। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার কাছে সবাই হার মানেন। তাঁর মতবাদ মেনে নেন। তিনি একে একে কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করেন।

শঙ্কর তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। তিনি ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে (বদরিকাশ্রমে) যোশী মঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। এই মঠ পরিচালনার জন্য তাঁর চারজন শিষ্যকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য ও হস্তামলকাচার্য। শঙ্করাচার্য বিভিন্ন দলীয় সন্ন্যাসীদের এই সব মঠে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। এটা তাঁর একটি উজ্জ্বল কীর্তি।

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কেনো পার্থক্য নেই—এ-কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এত অসাধারণ কাজ করে আচার্য শঙ্কর উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে ইহলীলা সংবরণ করেন। তার আগে অবশ্য তিনি মায়ের অন্তিম শয্যায় উপস্থিত ছিলেন, যেহেতু তিনি মাকে কথা দিয়েছিলেন।

শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর কাব্য থেকে কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো:

১. কে তব কান্তা আর কে তব কুমার?
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার।
কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার,
ভাব করহ ভাই, এই তত্ত্ব সার।

২. পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
জীবন তেমন হয় অতীব চপল।

জানিও করেছে গ্রাস ব্যাধি বিষধর,
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর ।

৩. দিবস যামিনী আর সায়াহ্ন প্রভাত,
শিশির বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত ।
এই রূপে খেলে কাল ক্ষয় পায় আয়ু,
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশা-বায়ু ।

৪. যতদিন করে নর ধন উপার্জন,
ততদিন থাকে বশে নিজ পরিজন ।
পরে যবে বৃদ্ধ কালে জীর্ণ হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসা ঘরে নাহি করে কেহ ।

পাঠ ৬ ও ৭ : প্রভু নিত্যানন্দ

১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী । হাড়াই পণ্ডিত ছিলেন একজন সৎ ব্রাহ্মণ । পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি এবং যজনযাজনের কাজ মিলিয়ে তাঁর সংসারটি ছিল বেশ সচ্ছল ।

নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের । গ্রামের পাঠশালায় পিতা তাঁর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেন । ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন । কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর একদম মন ছিল না । তার চেয়ে ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বেশি । ধর্মকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন । পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তিনি খেলাধুলা করতেন বটে, তবে খেলার পরিবর্তে কোনো মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতে তাঁর বেশি ভালো লাগত । তাঁর এই ধর্মানুরাগের মূলে ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । কুবের শুধু শ্রীকৃষ্ণের কথাই ভাবতেন । কীভাবে তাঁকে পাওয়া যায়– এই ছিল তাঁর সারাক্ষণের ভাবনা । কোনো সাধু– সন্ন্যাসীকে দেখলেই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন কী করলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে ।

কুবেরের বয়স তখন বারো বছর । একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন তাঁদের গাঁয়ে । উঠলেন তাঁদেরই বাড়ি । তিনি বৃন্দাবনে যাবেন । কুবের শুনেছেন বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র । তাই তিনি ভাবলেন, বৃন্দাবন

গেলে হয়তো তাঁর প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। কুবের সন্ন্যাসীকে তাঁর মনের কথা বললেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নেয়া ঠিক নয়। তাছাড়া সন্ন্যাস নিতে হলে পিতা-মাতার সম্মতি লাগে।'

কিন্তু কুবের নাছোড়বান্দা। তিনি বৃন্দাবনে যাবেনই। অগত্যা পিতা-মাতার সম্মতি নিয়ে তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বছরের পর বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন কুবের সন্ন্যাসীকে হারিয়ে ফেললেন। তারপর তিনি একাই বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে। এখানে এসে কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয় পরম সন্ন্যাসী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে। তাঁর কাছে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন। গুরুর সঙ্গে কিছুদিন বৃন্দাবনে থেকে কুবের আবার বেরিয়ে পড়েন তীর্থ পর্যটনে। একা একা বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়ান। এ সময় তিনি রামেশ্বর, নীলাচল, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহের ব্যাকুলতা তাঁর ক্রমশই বাড়তে থাকে। তাঁর একটাই চিন্তা—কৃষ্ণদর্শন কীভাবে হবে। তাই তিনি আবার বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

কুবের সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন। কীভাবে কখন কৃষ্ণদর্শন হবে—এই তাঁর একমাত্র ভাবনা। এই ভাবনায় তাঁর দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন। কৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, 'তুমি গৌড় দেশে নবদ্বীপে যাও। সেখানে নিমাই পণ্ডিত আচণ্ডালে প্রেমভক্তি প্রচার করছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দাও।' উল্লেখ্য যে, এই নিমাই পণ্ডিতই শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত।

এভাবে স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন হওয়ায় কুবেরের মন অনেকটা শান্ত হয়। স্বপ্নে হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছেন। তাই তাঁর আদেশে তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপের পথে রওনা হলেন। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুজন দুজনকে চিনতে পারেন, বুঝতে পারেন। তাঁরা দুয়ে মিলে যেন এক। জীবোদ্ধারের জন্য যেন দুই দেহে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। সেদিন থেকে কুবেরের নতুন নাম হলো নিত্যানন্দ। সংক্ষেপে নিতাই। আর গৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত নাম গৌর। ভক্তরা সংক্ষেপে বলতেন গৌর-নিতাই।

গৌর-নিতাই দুজনে নবদ্বীপে প্রেমভক্তি প্রচার করতে লাগলেন। নেচে-গেয়ে তাঁরা হরিনাম বিলাতে লাগলেন। তাঁদের প্রেমধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই। উঁচু-নীচু নেই। তখন সমাজে শুষ্ক ধর্মাচরণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। মানবপ্রেম তার নীচে চাপা পড়েছিল। তাই প্রেমভক্তি দিয়ে গৌর-নিতাই সমাজের সবাইকে কাছে টেনে নিলেন। ফলে দলে-দলে লোক তাঁদের অনুসারী হলো।

কিন্তু বৈষ্ণববিদ্বেষীরা গৌর-নিতাইয়ের এই প্রেমধর্ম প্রচারে বাধা দিতে লাগলেন। কখনো কখনো তাঁদের ওপর আক্রমণও চালান।

তখন নবদ্বীপে জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই ভাই নগর কোতোয়ালের কাজ করতেন। লোকে তাঁদের বলত জগাই- মাধাই। তাঁরা ছিলেন মদ্যপ এবং ভয়ংকর প্রকৃতির। যখন যা খুশি তা-ই করতেন। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করত না। নিত্যানন্দ এ-কথা জানতে পারলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে বললেন, 'জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে হবে।' প্রভু মৌন সম্মতি দিলেন।

তারপর একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস কৃষ্ণনাম করতে করতে পথ দিয়ে ফিরছেন। হঠাৎ জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা। মদ খেয়ে তখন তাঁরা মাতাল। কৃষ্ণনাম শুনে তাঁরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মাধাই একটা ভাঙা কলসির কানা ছুড়ে মারলেন নিতাইয়ের দিকে। মাথায় লেগে কেটে গেল। দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু নিত্যানন্দ এক হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে কৃষ্ণনাম গেয়েই চললেন। এতে মাধাই আরো ক্ষেপে গিয়ে আবার নিতাইকে মারতে গেলেন। কিন্তু জগাই তাঁকে আটকালেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন পথচারী সেখানে জড় হয়েছেন। নিতাইয়ের অবস্থা দেখে তাঁদের মায়া হলো। কিন্তু জগাই-মাধাইয়ের ভয়ে কেউ কোনো কথা বলল না।

ঘটনাটি শ্রীগৌরাঙ্গের কানেও গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দল-বল নিয়ে ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। জগাই-মাধাইকে তিনি কঠোর দণ্ড দেবেন। নিত্যানন্দ তখন এগিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু, জগাইয়ের কোনো দোষ নেই। সে আমাকে রক্ষা করেছে। মাধাইও ভুল করে এ-কাজ করেছে। তুমি এদের ক্ষমা করে দাও।'

নিত্যানন্দের কথা শুনে গৌরাঙ্গ অনেকটা শান্ত হলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে জগাইকে বুকে টেনে নিলেন। তা দেখে মাধাইয়ের মনে অনুশোচনা এলো। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু, আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করে দাও।' গৌরাঙ্গ বললেন, 'নিতাই যদি তোমায় ক্ষমা করে তাহলে তুমি ক্ষমা পাবে।' এরপর মাধাই জোড়হাতে এগিয়ে গেলেন নিত্যানন্দের দিকে। নিত্যানন্দ তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। এভাবে গৌর-নিতাই তাঁদের প্রেমভক্তি দিয়ে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করলেন। উপস্থিত লোকজন সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এভাবে গৌর-নিতাই নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম কীর্তন ও প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতে লাগলেন। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ কমতে লাগল। এমন সময় একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে গেলেন। নিত্যানন্দও সঙ্গে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর গৌরাঙ্গ একদিন বললেন, 'নিত্যানন্দ, গৌড়ে এখন একদিকে চলছে শক্তি বা তন্ত্রসাধনা, অন্যদিকে চলছে নব্যন্যায়ের যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানতত্ত্বচর্চা। ধর্মপিপাসু সাধারণ মানুষ কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তুমি সেখানে গিয়ে সংসারী হও এবং বিদ্বান, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র সকলের মধ্যে হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম বিতরণ কর। সকলকে এক কৃষ্ণনামে আবদ্ধ কর।'

একথা শুনে নিত্যানন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। তাকে প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু প্রভুর আদেশ। মানতেই হবে। তাই নিত্যানন্দ গৌড়ে ফিরে এলেন এবং কালনার অধিবাসী সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের নিয়ে তিনি খড়দহে সংসার পাতেন। বসুধার পুত্র বীরভদ্র। জাহ্নবীর কোনো সন্তান না থাকায় তিনি এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রামাই গোস্বামী। খড়দহের গোস্বামীরা এঁদেরই বংশধর। নিত্যানন্দ ধারার গোস্বামীরা গৌড়দেশের সমাজজীবনে বেশ কিছুকাল ধরে প্রেমধর্মের প্রসার ঘটান।

গৌরাঙ্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গৌড়রাজ্যে, বিশেষত নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনামের পাশাপাশি তিনি কীর্তন করতেন:

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সে হয় আমার প্রাণ।

এভাবে তিনি কৃষ্ণনামের সঙ্গে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরূপে গৌড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। ধর্মতত্ত্বের কোনো বিচার-বিশ্লেষণ বা তর্ক-বিতর্ক নেই, আচার-অনুষ্ঠানের কোনো বাড়াবাড়ি নেই, শুধু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ আর কৃষ্ণনামগান। এভাবে প্রেমভক্তি আর কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি অনেক পাপী-তাপীকে উদ্ধার করেছেন। সকলকে কৃষ্ণভক্তরূপে ভালোবেসেছেন। তাঁর এই জীবোদ্ধারের কথা সারা গৌড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দলে-দলে লোকজন তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকে। এর ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ জীবনে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সকলে সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গৌড়বাসীর অন্তরে। ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে এই মহাসাধক ইহলীলা সংবরণ করেন।

পাঠ ৮ : মীরাবাঈ

ভারতের রাজস্থানে কুড়কি নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঠোর বংশে মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রত্নসিংহ ছিলেন মেড়তার অধিপতি রাও দুধাজীর পুত্র। মা বীর কুঁয়রী ছিলেন ঝালাবংশীয় রাজপুত্র শূরতান সিংহের কন্যা। রত্নসিংহ কুড়কি অঞ্চলে বারোখানা গ্রামের জায়গির পেয়ে সেখানেই গড় নির্মাণ করে বাস করতেন।

মীরা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাই খুব আদর-যত্নে তিনি লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু মাত্র আট বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। ফলে তাঁর জীবনে একটা ছন্দপতন ঘটে। পিতা রত্নসিংহ মেয়েকে নিয়ে অনেকটা বিপদে পড়েন। তখন পিতামহ রাও দুধাজী মীরাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। পরম যত্নে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন।

দুধাজী নিজে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। মেড়তার প্রাসাদের পাশে ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজজীর মন্দির। তিনি নিয়মিত সেখানে পূজার্চনা করতেন। মাঝে মাঝে মীরাও সেখানে যেতেন। মন্দিরের পুরোহিত গদাধর পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনা করতেন। মীরা আগ্রহভরে তা শুনতেন। পিতামহ দুধাজীও মাঝে মাঝে তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনি শোনাতেন।

এর ফলে ছোটবেলা থেকেই ধর্মজীবনের একটা আদর্শ মীরার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। বালিকা বয়সেই মীরা ভক্তিরসাত্মক ভজন রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। চতুর্ভুজজীর মন্দিরের দেয়ালে মীরার কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভজন উৎকীর্ণ আছে।

একবার এক সাধু মীরাকে গিরিধারী গোপালের একটি বিগ্রহ দেন। মীরা সেটি প্রাসাদে নিয়ে নিত্য তার সেবা-পূজা করতেন। এর ফলে ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণের প্রতি মীরার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

মীরা যৌবনে পা দিয়েছেন। রূপলাবণ্যে তিনি অনন্যা। পিতামহ দুধাজী নাতনির বিবাহ ঠিক করলেন। পাত্র চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজ। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহাসমারোহে মীরার বিবাহ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি।

শ্বশুরবাড়িতে কোনো কিছুর অভাব নেই। রাণা সংগ্রামসিংহের মতো শ্বশুর। ভোজরাজের মতো সুযোগ্য স্বামী। অতুল ঐশ্বর্য। অসংখ্য দাস-দাসী। কিন্তু এ-সবের প্রতি মীরার কোনো আসক্তি নেই। জীবনে তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু হলো কৃষ্ণপ্রেম আর গিরিধারীলালের সাক্ষাৎ লাভ। তিনি শুধু সাধন-ভজন নিয়েই থাকেন। প্রাসাদে কোনো সাধু-সন্ত এলে ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। একমনে হরিকথা শুনতেন। কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট হয়ে নিজের কণ্ঠেই শুরু করতেন ভজন গান। তাঁর কণ্ঠ এত মধুর ছিল যে সবাই মন দিয়ে তা শুনত।

ভোজরাজ স্ত্রীর প্রতি ছিলেন উদার ও সহনশীল। তিনি স্ত্রীর মনের কথা বুঝতে পারেন। তাই একটি কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করে সেখানে কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করে দেন। মীরা এতে খুব খুশি হন। স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি বেড়ে যায়। কিন্তু সময় কাটে তাঁর কৃষ্ণভজনে। সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। এতে আত্মীয়-পরিজন ও প্রাসাদের লোকজনের মধ্যে নিন্দা ও সমালোচনা শুরু হয়ে যায়।

ক্রমশ মীরার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। রাজবধূর বেশে তিনি যেন এক সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী। দিনে-রাতে প্রায় সময়ই তিনি ভজন-পূজনে ব্যস্ত থাকেন। ইষ্টদেব গোপীনাথের জন্য মাঝে মাঝে কাঁদতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় ভোজরাজ একদিন স্ত্রীকে ডেকে বলেন, তোমার প্রাণের বেদনা কোথায়, প্রাণের আকুতি কী তা খুলে বল। বল, তুমি কী চাও। কী পেলে তুমি সুখী হবে, কীসে শান্তি লাভ করবে তা আমায় বল।

মীরা তখন মধুর কণ্ঠে একটি ভজন গেয়ে তার উত্তর দিলেন:

মেরে ত গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ
জাঁতে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোঈ।

অর্থাৎ গিরিধারী গোপাল ছাড়া আমার কেউ নেই। যাঁর মাথায় ময়ূর-মুকুট তিনিই আমার পতি।

ভোজরাজ স্ত্রীর সংগীত শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনের কথাও বুঝতে পারলেন। তিনি মীরার সাধন-ভজনে সার্বিক সহযোগিতা করতে লাগলেন।

এদিকে রাজবধূ মীরার কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতার কথা চিতোরের সাধারণ মানুষ এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা জেনে গেছেন। তাঁরা মীরাকে রাজমহিষী নয়, বরং ভক্তিসাধিকা মীরাবাঈ বলে জানলেন। মীরার সুমধুর কণ্ঠের সংগীত এবং প্রেম সাধনার কথা সমগ্র রাজস্থানেই প্রচারিত হলো।

এ অবস্থায় ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভোজরাজ হঠাৎ মারা যান। এর অল্পকাল পরে শ্বশুর রাণা সংগ্রামসিংহও মারা যান। তখন চিতোরের নতুন রাণা হন বিক্রমজিৎ সিং। তিনি মীরার ওপর নানা অত্যাচার করতে থাকেন। তাঁকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর আরাধ্য গিরিধারীর কৃপায় তিনি রক্ষা পান।

শেষ পর্যন্ত মীরাবাঈ পিতৃগৃহ মেড়তায় ফিরে যান। সেখান থেকে চলে যান বৃন্দাবনে। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর আচার্য। মীরা তাঁর দর্শন কামনা করেন। কিন্তু আচার্য স্ত্রীলোককে দর্শন দিতে রাজি নন। তখন মীরা বলেন, 'গোস্বামীজী কি ভাগবতের কথা বিস্মৃত হয়েছেন? বৃন্দাবনের একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আর সকলেই প্রকৃতি। তবে তত্ত্বদর্শী গোস্বামীজী আমাকে দর্শন দিতে এত কুণ্ঠিত কেন?'

মীরার তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রীত হন এবং মীরার সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলেন। মীরার কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা গোস্বামীকে মুগ্ধ করে।

বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দিকে দিকে তাঁর নাম প্রচারিত হয়। রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মীরার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবান প্রাপ্তির পথপ্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত ভজন-সংগীত কৃষ্ণপ্রেমের গান, কৃষ্ণের উপাসনা এবং ভগবৎ সাধনার এক নতুন পথপ্রদর্শন করে। এই সঙ্গীতধারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। এই সম্প্রীতি যে মিলনধারায় প্রকাশ লাভ করে, তার নাম 'ভক্তিবাদ'। হিন্দুধর্মের ভাগবতধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সুফিবাদে সকল শ্রেণির মানুষকে সমান চোখে দেখা হয়।

অতঃপর একদিন বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করে মীরা কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। দ্বারকাধামে এসে রণছোড়জীর বিগ্রহের ভজন-পূজনেই জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এই দ্বারকাধামেই তাঁর দেহলীলা সংবরণ হয়।

২০২৫

মীরাবাঈয়ের জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যাঁরা প্রকৃত সাধক তাঁরা জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যান। দৈহিক রূপ-লাবণ্য, পার্থিব বিষয়-আশয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের চিত্তকে আকর্ষণ করে না। সবকিছু ছেড়ে তাঁরা কাম্য বস্তুকে লাভ করার জন্য একাগ্রচিত্তে সাধনা করেন। সে সাধনায় তাঁরা সফলও হন।

পাঠ ৯ ও ১০ : শ্রীরামকৃষ্ণ

'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ ধর্মীয় মত ও পথ ভিন্ন হলেও সকল মানুষের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক—ঈশ্বর লাভ। এই পরম সত্যটি যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে তাঁর জন্ম ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবী। পিতা-মাতা বিষ্ণুর অপর নামানুসারে শিশুপুত্রের নাম রাখেন গদাধর। এই গদাধরই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে জগদ্বিখ্যাত হন।

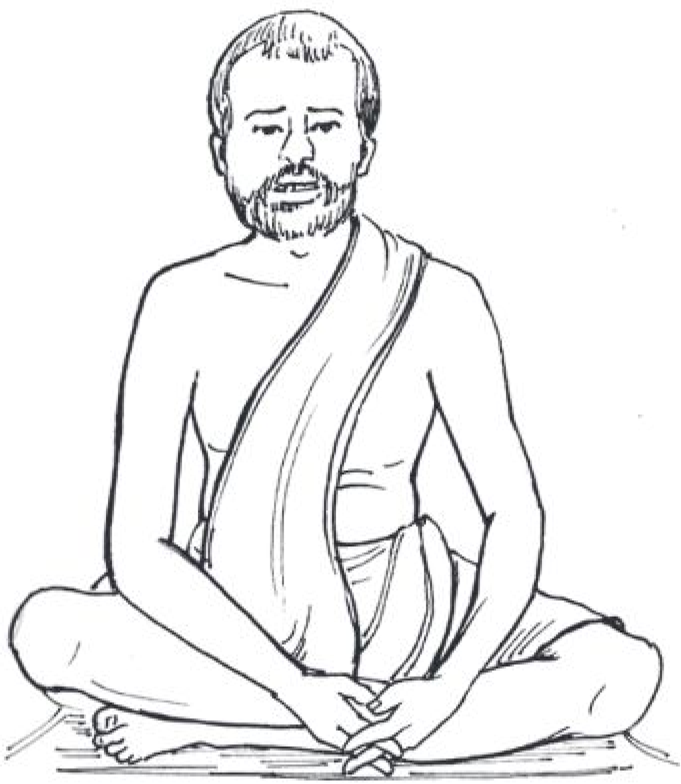

বালক গদাধর দেখতে ছিলেন খুবই সুন্দর এবং প্রকৃতিপ্রেমী। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে কিংবা আকাশে উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে মাঝে মাঝে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। এটা ছিল তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না একেবারেই। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার কিছু শুনলেই মুখস্থ বলতে পারতেন। এভাবে তিনি পিতার কাছ থেকে শেখেন ধর্মীয় শ্লোক ও স্তব-স্তোত্র, গ্রামের কথকদের কাছ থেকে শেখেন রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে শেখেন ধর্মগীতি। ভজন-কীর্তনের প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। এভাবে গদাধর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

গদাধরের অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তিনি কখনো শ্মশানে গিয়ে বসে থাকেন। কখনো বা নির্জন বাগানে গিয়ে সময় কাটান। সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কৌতূহল ভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন। তাঁদের নিকট ভজন শেখেন। এ অবস্থায় অগ্রজ রামকুমার তাঁকে কোলকাতা নিয়ে যান। সেখানে ঝামাপুকুরে অবস্থিত নিজের টোলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু গদাধরের মনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আগের মতোই লেখাপড়ায় তিনি উদাসীন থাকেন।

এমন সময় রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধরও তাঁর সঙ্গে আসেন। মা-কালীর বিগ্রহ এবং পুজার্চনা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হন। তিনি যেন এতদিন এমন একটা কিছুই চেয়েছিলেন। তাই কখনও তিনি মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হয়ে থাকেন, কখনও বা আত্মমগ্ন অবস্থায় গঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়ান।

হঠাৎ একদিন অগ্রজ রামকুমারের অকালমৃত্যু হয়। ফলে মায়ের পূজার ভার পড়ে গদাধরের ওপর। মনেপ্রাণে তিনি মায়ের পূজা আরম্ভ করেন। মায়ের পূজায় ভক্তিগীতি গাওয়ার সময় প্রায়ই তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। কালক্রমে এখানেই কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন, যা অচিরেই তাঁকে 'আধ্যাত্মিক জননী' পদে উন্নীত করে। এভাবে গদাধর সর্বত্র চৈতন্যরূপিণী দেবীর দর্শন লাভ করেন।

১৮৫৫ সনে গদাধর মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন। এতে তাঁর কালীসাধনার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। এর ছয় বছর পর ১৮৬১ সালে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধর তাঁকে গুরু মানেন এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই ভৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী এবং অবতার পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন।

এরপর গদাধরের সাধন জীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। তিনি গদাধরকে বেদান্ত সাধনায় দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ একই সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

রামকৃষ্ণ শুধু হিন্দু ধর্মমতভিত্তিক সাধনায়ই আবদ্ধ থাকেননি। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মমতেও সাধনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন ধর্ম সাধনার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে সকল ধর্মেই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। ধর্মসমূহের পথ ভিন্ন হলেও সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা। তাই তিনি উদার কণ্ঠে বলেছেন, 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ।' তিনি প্রথাগত সন্ন্যাসীদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা তাঁদের মতো পোশাকও পরতেন না। এমনকি তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। ধর্মের জটিল তত্ত্ব তিনি গল্পের মাধ্যমে সহজ করে বোঝাতেন। ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা—এই ছিল তাঁর দর্শন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই ধর্মীয় আদর্শ জগদ্বাসীকে শুনিয়ে গেছেন, যার ফলে তাঁর এই জীবসেবার আদর্শ অর্থাৎ মানবধর্ম আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন থেকে সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধন-দর্শনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণী দক্ষিণেশ্বরে আসতে থাকেন। তাঁর উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শে মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতীয় আদর্শে ফিরে আসেন। তিনি যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেতেন, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিকট আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরো অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফরাসি মনীষী রমাঁরলাঁ বিবেকানন্দের কাছ থেকে শুনে এতটাই প্রভাবিত হন যে, তিনি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এক বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু মুখের কথা নয়, সেগুলো তাঁর জীবনচর্চায় রূপায়িত সত্য। তিনি অহংকারশূন্য হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। দরিদ্রদের দেখলে তাঁর মন কাঁদত। একবার তিনি তীর্থ দর্শনে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে রানি রাসমণির জামাতা মথুরবাবু। তাঁরা তখন দেওঘরে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মনে খুব ব্যথা পেলেন। তিনি মথুরবাবুকে বললেন দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করতে। মথুরবাবু তাই করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কালীর সাধক। কালীমূর্তিতে তিনি পুজো দিতেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি মায়ের সাধনা করতেন। তাই বলে মূর্তিপূজার বিরোধী ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। কেশবচন্দ্রই প্রথম তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার মাধ্যমে রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রচার করেন। এ থেকেই বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর সাধন-প্রণালি এবং ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বড় অবদান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখতেন না। তিনি দেখতেন মানুষের অন্তর। তাই তাঁর কাছে উঁচু-নীচু সব শ্রেণির মানুষ আসত। তাইতো দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করতেন। নারীমাত্রই তাঁর কাছে ছিল মাতৃস্বরূপা। তাইতো নিজের স্ত্রীকেও তিনি মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছিলেন। জগতে এরূপ ঘটনা দ্বিতীয়টি আর নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যখন বাইরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালোবাসবে। মিশে যেন এক হয়ে যাবে। বিদ্বেষভাব রাখবে না। ও সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রিষ্টান—এই বলে কাউকে ঘৃণা করবে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে উদার মনোভাব, এর দ্বারা ভারতের লোকজন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর কাছে এসেছেন। তাঁর অমৃত বাণী শ্রবণ করেছেন। অন্তরে পরম শান্তি পেয়েছেন।

শুধু ভারতীয়রাই নন, শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মমত দ্বারা বিদেশিরাও বিমোহিত হয়েছেন। এক রাশিয়ান অধ্যাপক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (গস্‌পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ) পড়ে বলেছেন, 'এত উদার, এত বিশ্বজনীন, সর্বজনীন ভাব আর কোথাও দেখা যায় না।' একজন ইহুদি বলেছেন, 'ইজরাইলে একটি রামকৃষ্ণ সেন্টার হওয়া উচিত।' একজন আফ্রিকান বলেছেন, তিনিও তাঁর দেশে একটি রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার খুলতে চান।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন। তাঁর সাধনাস্থান দক্ষিণেশ্বর এখন অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি করো। জগৎরূপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।

২. মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।

৩. ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নেই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।

৪. ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়। প্রত্যেক ধর্মই সত্য।

৫. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়। 'যত মত তত পথ'।

৬. পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য-অনিত্য মিশে আছে। বালিতে-চিনিতে মেশানো। পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

৭. জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই। কিন্তু নৌকার ভেতরে যেন জল না ঢোকে। তাহলে নৌকা ডুবে যাবে।

৮. ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভালো লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে দেখা যায়।

৯. ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল নিচ্ছে একঘাটে, বলছে জল; মুসলমানরা আর একঘাটে নিচ্ছে, বলছে পানি; ইংরেজরা আর একঘাটে নিচ্ছে, বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক একঘাটে নিচ্ছে, বলছে Aqua। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক– ঈশ্বরলাভ। এতে জাতিভেদ থাকবে না। ভক্তের কোনো জাতি নেই। ঈশ্বরের বহু নাম। ভক্তিভরে যে-কোনো নামে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। সকল ধর্মে ভক্তি থাকলে ভক্তিতে দেহ, মন, আত্মা শুদ্ধ হয়। দরিদ্র নারায়ণ, তার সেবা করতে হবে। এতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই নীতিশিক্ষা অনুসরণ করব। তাহলে আমরা যথার্থ মানুষ হতে পারব।

পাঠ ১১ : শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বাংলা ১২৪৮ সালের (১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস। তখন ছিল পূর্ণিমা তিথি। নবদ্বীপের শান্তিপুরে প্রতি বৈষ্ণব মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই উৎসবমুখর পুণ্য তিথিতে ভোর বেলায় বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত। মা স্বর্ণময়ী দেবীও ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ দয়াবতী রমণী।

বিজয়কৃষ্ণ গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তারপর ভর্তি হন শান্তিপুর টোলে। সেখানের পড়া শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে। এ-সময় তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রী যোগমায়া ছিলেন শিকারপুরের রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা।

সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়ার পর বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে 'হিতসঞ্চারিণী' নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভার সিদ্ধান্ত ছিলঃ যিনি যা সত্য বলে বুঝবেন, তিনি তা প্রাণপণে কার্যে পরিণত করবেন। এই সভায় বিজয়কৃষ্ণ এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, 'পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন। তাই আমাদের পৈতা ত্যাগ করা উচিত।' এ-কথা শুনে যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁরা সবাই পৈতা ফেলে দেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ হয়ে পৈতা ফেলে দেওয়া এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের যোগাযোগ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের এই পৈতা বর্জন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা ভালো চোখে দেখেননি। বিজয়কৃষ্ণ এ-সময় শান্তিপুরে এলে তাঁর প্রতি তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিজয়কৃষ্ণও তাঁর মত ও বিশ্বাসের ব্যাপারে আপোষ করেন নি। তিনি কোলকাতা চলে আসেন।

তখন বিজয়কৃষ্ণের মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষা সামনে। তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ থেকে ডাক এল ধর্ম প্রচারের। চিকিৎসক জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, খুলনা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। অনেককে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাও দেন।

বিজয়কৃষ্ণ এক সময় উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি এক কঠিন অসুখে পড়েন। সেবার বারদীর শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর কৃপায় তিনি সুস্থ হন। এ ঘটনা তাঁর জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলে।

বাবা লোকনাথ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর মধ্যে আবার বৈষ্ণব ভাব জেগে ওঠে। এ-সময় গয়ার আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয় যোগী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে। তিনি তাঁকে দীক্ষা দিয়ে পুনরায় হিন্দু যোগীতে পরিণত করেন। এরপর বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম ছেড়ে দেন।

এ-সময় বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং শিষ্যদের নিয়ে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়েন। তখন লোকনাথ বাবার নির্দেশে তিনি ঢাকার গেন্ডারিয়ায় আশ্রম স্থাপন করে নামগান ও হরিসংকীর্তন করতে থাকেন। এতে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ঢাকায় তাঁর যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করলেও মাঝে মাঝেই তনি কোলকাতা যেতেন। একবার স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে কলেরা রোগে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীক্ষেত্র পুরী চলে যান। সেখানে অতি অল্প সময়েই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। উড়িষ্যা প্রদেশেও তাঁর প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্থানীয় ধর্মব্যবসায়ীরা একদিন তাঁকে বিষ মিশ্রিত লাড্ডু খেতে দেয়। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩০৬ সালের (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ২২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ

১. হরিনামে প্রেম লাভের আটটি ক্রম–

ক. পাপবোধ
খ. পাপকর্মে অনুতাপ
গ. পাপে অপ্রবৃত্তি
ঘ. কুসঙ্গে ঘৃণা
ঙ. সাধুসঙ্গে অনুরাগ
চ. নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি
ছ. ভাবোদয়
জ. প্রেম।

২. অন্তরে হিংসা থাকলে ঈশ্বরের লীলা দর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্যও হৃদয় হিংসাশূন্য হয়, তখন লীলা দর্শন হতে পারে।

৩. কখনো পরনিন্দা করবে না।

৪. সত্য কথা বলবে ও সর্বদা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে।

৫. সর্বদা নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের নাম করবে।

৬. সর্বজীবে দয়া করবে।

৭. বৃথা অহংকার করবে না।

৮. শাস্ত্র ও মহাজনদের বিশ্বাস করবে।

পাঠ ১২, ১৩ ও ১৪ : স্বামী বিবেকানন্দ

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

জীবের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার এমন কথা আর কে কবে বলেছেন? বলেছেন একজনই। এই অমর বাণীর সেই প্রবক্তা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কোলকাতায় তাঁর জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন সুগৃহিণী।

বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন জেনারেল এ্যাসেম্বলি কলেজ (বর্তমানে স্কটিস চার্চ কলেজ)-এর ছাত্র, তখন কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি এক বিতর্কসভায় নরেন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, জার্মান বা ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মতো কোনো ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সনে বিএ পাশ করেন। তার আগেই তাঁর মধ্যে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন তাঁর মনকে আন্দোলিত করে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু কারো উত্তর তাঁর মনঃপূত হয়নি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।'

এই সাদাসিধে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণও নরেন্দ্রনাথকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি যেন এতদিন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। একসময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। নিজের চোখে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখলেন। কীভাবে এ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর এক সময় কন্যাকুমারীকায় ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ঐ শিলাখণ্ডের নাম এখন 'বিবেকানন্দ শিলা।' ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে মানবসেবা। এই ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বুঝতে পারলেন, বৈরাগ্য ও সেবাধর্ম হচ্ছে ভারতীয়দের জাতীয় আদর্শ এবং এ পথেই তাদের জাতীয় শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক–ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' তিনি আরো বলেন, 'খ্রিষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না: অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশলাভ করবে।' বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই মুগ্ধ হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। আমেরিকার 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকা মন্তব্য করে,'স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার পর মনে হবে ভারতের মতো জ্ঞানৈশ্বর্যমণ্ডিত দেশে আমাদের দেশের ধর্মপ্রচারক পাঠানো নির্বুদ্ধিতার কাজ।'

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন ও মানবধর্ম সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে তাঁকে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়। বিবেকানন্দ তাঁর মতাদর্শ প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে একের পর এক বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত সত্য তুলে ধরেন। বেদান্তের মূল কথা হলো–'জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই; জীবই ব্রহ্ম।' তাই ব্রহ্মজ্ঞানে জীবসেবা করতে হবে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তির পূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। তাঁর বক্তৃতা থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেয়। তার উত্তরে তিনি সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, 'শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও

কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস–এদুটি জিনিসই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।'

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। তিনি অথর্ববেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'অসত্য নয়, সত্যেরই জয় হয়: একমাত্র সত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভের পথ প্রসারিত হয়।' যে ব্যক্তি জগতের জন্য তার ক্ষুদ্র 'আমিকে' ত্যাগ করতে পারে, সে দেখে সমস্ত জগৎ তার। যে ব্যক্তি পবিত্র এবং সাহসী, সেই সব কিছু করতে পারে।

বিবেকানন্দের কাছে কোনো জাতিভেদ ছিল না। তিনি বলতেন–নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। তাঁর এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ যুবকরা পর্যন্ত কলেরাপীড়িত চণ্ডালদের পাশে বসে তাদের সেবা করেছেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর দশ বছর পরে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর রচনাবলি পড়ে অনুভব করতে পারেন যে, মানবসেবাই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। তাই নিঃস্বার্থ সেবাকেই তিনি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র করেন এবং পরবর্তীকালে 'নেতাজি' ভূষণে ভূষিত হন।

বিবেকানন্দ নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন–সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষালাভ করতে পারে, তাহলে এযুগের নারীরা পারবে না কেন? তাঁর মতে যে-জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে-জাতি কখনো বড় হতে পারে না। 'নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোন পাখি একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না।' এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

বিবেকানন্দ দেশের উন্নতির জন্য সমাজ সংস্কারের কথাও ভাবতেন। তিনি বলতেন– দেশের উন্নতি করতে হলে সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন প্রয়োজন। তিনি সমাজের নীচু স্তরের মানুষদের প্রতি উঁচু স্তরের মানুষের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। সারা দেশ ঘুরে তিনি শ্রমিক শ্রেণির মানুষের অবস্থা দেখেছেন। তাঁদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এক সময় এঁরাই ভারতবর্ষ শাসন করবেন। তাই তিনি বলেছেন, '... নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

বিবেকানন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি বলতেন–দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তবেই একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলা

সম্ভব হবে। শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবাই যাতে সমান শিক্ষা পায়। তাই তিনি বলতেন– ব্রাহ্মণের ছেলের যদি একজন শিক্ষকের দরকার হয়, তাহলে শূদ্রের ছেলের দু'জন বা তার চেয়ে বেশি শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি চাইতেন– ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকুক, তবে ব্রাহ্মণ যেন চেষ্টা করেন শূদ্রকেও তাঁর নিজের পর্যায়ে তুলে আনতে। নিজে মানুষ হওয়া এবং অন্যকেও প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করা– এটিই হওয়া উচিত মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবেকানন্দ অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন– দরিদ্ররা যদি স্কুলে না আসতে পারে তাহলে শিক্ষাকেই তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে যেখানে তারা কাজ করে সেখানে। তিনি আরো বলেছেন, 'সামর্থ্য না থাকলে একটি কুঁড়েঘর বানাও। সেখানে গরিব লোকেরা সাহায্য নিতে ও উপাসনা করতে আসবে। সেই মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা ধর্মকথা ও পুরাণকথা পাঠ হবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেবে।'

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তিনি বলেছেন, 'অন্ন চাই! অন্ন চাই! দরিদ্রের মুখে অন্ন জোগাতে হবে। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম। যারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের আমরা ধর্মোপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছি। ধর্মমতবাদে কি পেট ভরে? সব কিছুরই প্রথম অংশ পাবে দরিদ্র। আমাদের অধিকার শুধু অবশিষ্টাংশে। দরিদ্ররা ঈশ্বরের প্রতিভূ; যেই লাঞ্ছনা ভোগ করে সেই ঈশ্বরের প্রতিভূ। দরিদ্রকে না দিয়ে যে আহারে আনন্দ পায় সে পাপে আনন্দ পায়।'

১৮৯৭ সনে বাংলার কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে ভগিনী নিবেদিতাকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমি আমার কিছু ছেলেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলাগুলিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছি। এটা ইন্দ্রজালের মতো কাজ করছে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই দেখছি। দেখছি একমাত্র হৃদয়ের মধ্য দিয়ে জগতের কাছে পৌঁছানো যায়।'

বিবেকানন্দ সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে মহাবীর বলে আখ্যায়িত করেন। তবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের পাশাপাশি তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার কথাও বলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন, 'বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের সন্তানসন্ততি ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ... লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তানসন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে।' শুধু তা-ই নয়, তিনি বলেছেন, 'ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলে গণ্য হওয়া উচিত।'

এভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার এবং দেশের উন্নয়নের কথাও ভেবেছেন। তিনি অন্য সন্ন্যাসীদের মতো কেবল ঈশ্বর-সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এমনটাই চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য ১৮৯৭ সনে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর একটি মঠও প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি 'বেলুড় মঠ' নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাংলাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবী ব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি অসংখ্য মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপৎকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতের আত্মা সেদিন জেগে উঠেছিল। দেশের ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণস্পন্দন। আত্মবিস্মৃত জাতি সেদিন দেশের সনাতন ধর্মজীবন থেকে প্রাণরস আহরণে প্রবৃত্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিবেকানন্দ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না। তাই বিশ্রামের অভাবে অল্পদিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে এই মহামনীষী দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী

১। ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

২। ওঠ, জাগো, আর ঘুমিয়ো না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভেতর রয়েছে– এ কথা বিশ্বাস কর, তাহলেই শক্তি জেগে উঠবে।

৩। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ।

৪। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারা যায়, সে-ই হচ্ছে শিক্ষা।

৫। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়।

৬। ভেবো না তোমরা দরিদ্র, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখেছে–টাকায় মানুষ করেছে! মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে। প্রাচীন ধর্ম বলত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলছে, যে আপনাতে বিশ্বাস না করে সে-ই নাস্তিক।

৭। বিশ্বাসই হলো মানবসমাজ ও সব ধর্মের সবচেয়ে বড় শক্তি।

৮। জীবসেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। জীবসেবা মানেই ঈশ্বরসেবা। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দারিদ্র্য দূর করতে হবে। কারণ খালি পেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, মুচি-মেথরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার বা-ই হোক। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলকেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত জাগতিক বা পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করব। প্রতিটি কাজে-কর্মে এর প্রতিফলন ঘটাব। তাহলে আমরাও জীবনে সফল হতে পারব।

পাঠ ১৫ ও ১৬ : শ্রীমা

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিস শহরে শ্রীমা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীরা। ভারতের পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে এসে তাঁর নাম হয় শ্রীমা। ভক্তরা তাঁকে এ নামেই ডাকতেন। ভারতবাসীর কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত।

শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে ওঠে। তাঁর বয়স যখন মাত্র চার, তখনই তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। আর পাঁচজন শিশুর মতো শৈশবেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। এতে তাঁর বাবা-মা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। শুধু পড়াশোনা নয়, পার্থিব কোনো কিছুর প্রতিই শ্রীমার কোনো আসক্তি ছিল না। তিনি শুধু ঈশ্বর চিন্তা করতেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকতেন।

প্যারিস শহরের বাইরে ছিল এক প্রকাণ্ড বন। শ্রীমা সময় পেলেই সেখানে গিয়ে গাছতলায় ধ্যানে বসতেন।

তখন পাখিরা নির্ভয়ে এসে তাঁর শরীরে বসত। কাঠবিড়ালীরা ছুটোছুটি করত তাঁর ওপর দিয়ে। এমনিভাবে বনের গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে তাঁর এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মায়ের বয়স যখন উনিশ বছর, তখন তিনি আলজিরিয়ার ক্লেমসেন শহরে যান। সেখানে তেঁও নামে এক বিখ্যাত গুণীন থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি হঠযোগ ও অনেক গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করেন।

দেশে ফিরে শ্রীমা আরো গভীর সাধনায় মগ্ন হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর আছেন। তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক মিলন সম্ভব। ঈশ্বরকে তিনি সব সময় জ্যোতির্ময়রূপে দেখতে চান। একবার তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি যেন তাঁকে বলছেন: ওঠ, আরো ওপরে ওঠ। সকলকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠ, কিন্তু সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দাও নিজের আত্মাকে।

শ্রীমা এবার ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়তে শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান ভারতবর্ষে আসার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বামী মঁসিয়ে পল রিশারকে নিয়ে চলে আসেন ভারতবর্ষে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা ২৯শে মার্চ পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে ঋষি অরবিন্দকে দেখে শ্রীমার স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন বিধিনির্দিষ্ট এক বিশেষ দিব্যকর্ম করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যেই আছে তাঁর আত্মার মুক্তি। সারা পৃথিবীর মধ্যে পণ্ডিচেরীর আশ্রমকেই তাঁর কাছে স্বর্গ মনে হলো। এই শান্ত তপোবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সকল সাধনার সিদ্ধি, তাঁর আত্মার চূড়ান্ত সার্থকতা। তাই তাঁরা দু'জনেই আশ্রমে থেকে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষা নিলেন। তাঁর সাধন কর্মের সহযোগী হয়ে উঠলেন। তখন আশ্রম থেকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় 'আর্য' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তাঁরা দু'জনেই এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অরবিন্দকে সাহায্য করতে লাগলেন।

কিন্তু এ যাত্রায় শ্রীমা বেশিদিন ভারতে থাকতে পারেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তাঁদের প্যারিসে ফিরে যেতে হলো। এতে মা-র মন খুব আকুল হয়ে ওঠে। শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর কাছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিচ্ছেদের মতো মনে হতে লাগল। তিনি আকুল নয়নে পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

এভাবে কেটে গেল প্রায় পাঁচ বছর। ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে। হঠাৎ অরবিন্দের কাছ থেকে তিনি আহ্বান পেলেন ভারতবর্ষে আসার। তাঁর মন উদ্বেল হয়ে উঠল। আর বিলম্ব নয়। তিনি যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল তিনি পণ্ডিচেরীতে পৌছান। তাঁর মন শান্ত হলো। এবার গুরুদেবের নির্দেশমতো তিনি নিয়মিত যোগ সাধনা শুরু করে দিলেন। ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে ভারতীয় যোগিনীর বেশ ধারণ করলেন। তাঁর পরনে তখন দেশি শাড়ি ও ব্লাউজ। খাদ্যদ্রব্যও দেশীয়।

আমিষের পরিবর্তে নিরামিষ। পরে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে মা ইউরোপীয় পোশাকও পরতেন। কারণ অরবিন্দ বলতেন, ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করতে পারলে বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে কিছু যায়-আসে না।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন। সেদিন থেকেই একটি ঘরে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন। ফলে আশ্রমের সমস্ত ভার পড়ে শ্রীমার ওপর। শ্রীমাও সর্বান্তঃকরণে সে ভার গ্রহণ করেন। তিনি পৈতৃকসূত্রে অনেক সম্পদ ও অর্থ পেয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আশ্রমের খরচ চালাতে লাগলেন। দিনদিন আশ্রমে লোকজন বাড়তে লাগল। শ্রীমাও অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে সকলের ভরণ-পোষণ করে যেতে লাগলেন। কর্মফলের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে তিনি পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন। খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গো-পালন প্রভৃতি বিভাগ খুলে শ্রীমা আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুললেন।

শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হয়। এজন্য যোগব্যায়াম প্রয়োজন। তাই আশ্রমে তিনি একটি ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীমা আশ্রমে একটি ছোট্ট পাঠশালা খোলেন। সেখানে ছেলে-মেয়েরা মনের আনন্দে লেখাপড়া করত। ক্রমে পাঠশালা থেকে বিদ্যালয় ও পরে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তার নাম হয় 'আন্তর্জাতিক শিল্পকেন্দ্র'। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে সবাইকে আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়। শ্রীমা এখানে ধর্ম ও কলাবিদ্যার এক সার্থক সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এখানে বিশ্বের যেকোনো শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারে।

আশ্রমবাসীদের চিকিৎসার জন্য শ্রীমা একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। এ হাসপাতালে সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

আশ্রমে যাঁরা থাকেন, তাঁদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করে। আশ্রমের নিজস্ব জমি, বাগান ও দুগ্ধ খামার আছে। সেসব থেকে চাল, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রীমা সত্যিকার অর্থেই আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন।

আশ্রমের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো সমস্তরকম ভেদজ্ঞানের বিলোপ। আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁদের সকলকেই কাজ করতে হয়। ছোট-বড় কাজে কোনো পার্থক্য নেই। যে-কেউ যেকোনো কাজ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি বলতে কিছু নেই। মা চাইতেন আশ্রমবাসীরা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে সকল ধর্ম সম্পর্কে উদার ও শ্রদ্ধাশীল হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষা নিয়ে আশ্রমের আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দিক।

আশ্রমের সকলকে মা সন্তানের ন্যায় ভালোবাসতেন। নিজের মায়ের মতোই তিনি সকলের সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। শুধু তা-ই নয়, আশ্রমের বৃক্ষ-লতা ও পশু-পাখির প্রতিও মায়ের গভীর ভালোবাসা ছিল। আশ্রমে নতুন অতিথি এলে মা সকলকে বুঝিয়ে দিতেন, কেউ যেন এদের প্রতি অসম্মান না করেন। কেউ যেন গাছের পাতা বা ফুল না ছেঁড়েন বা অকারণে গাছের ডাল না ভাঙেন।

মা সব সময় কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। কাজই যেন ছিল তাঁর জীবন। আজীবন তিনি কামনাহীন কর্মযজ্ঞ করে গেছেন।

মা শুধু একজন জ্ঞানতপস্বিনী বা রুক্ষ যোগিনীই ছিলেন না। তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড সৌন্দর্যবোধও ছিল। এক নিবিড় সৌন্দর্যবোধের দ্বারা তিনি বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য সাধন করে চলতেন। তিনি চাইতেন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও এমনি বাইরের প্রকৃতির মতো সুন্দর হয়ে উঠুক। এভাবে তিনি আশ্রমটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমিরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

মায়ের এক অভাবনীয় পরিকল্পনা ছিল শ্রীঅরবিন্দের নামে অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ পরিকল্পনা করেছিলেন। এর জন্য পণ্ডিচেরীর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ছয় মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে ১৫ বর্গমাইল ভূমি সংগ্রহ করা হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারি এর ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ভিত্তিমূলে পৃথিবীর ১২৬টি দেশের মাটি এনে জড় করা হয়। ঐসব দেশের তরুণ-তরুণীরা এ মাটি নিয়ে আসেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের শুভ জন্মদিনে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

মায়ের পরিকল্পনা ছিল, অরোভিল হবে একটি আধুনিক নগর। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করবে। সবাই হবে এক পরিবারের সদস্য। এখানে আধুনিক নগরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনা সবকিছুর চর্চা হবে এখানে। অরোভিল হবে সমগ্র বিশ্বমানবের। আন্তর্জাতিক মানব-ঐক্যের জীবন্ত ল্যাবরেটরি। এটি হবে একটি আত্মনির্ভরশীল জনপদ। এখানকার সকলেই হবে এর জীবনযাত্রা ও উন্নতির অংশীদার। তারাই নানাভাবে এর সকল কাজ করবে। কাউকে খাজনা দিতে হবে না। কাউকে খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না। সকলকে খাওয়াবার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করবে। সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার ও খাদ্যরীতি সম্পূর্ণই বজায় রাখা হবে। অরোভিল হবে সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে একমাত্র সত্যের সেবা।

মায়ের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অরোভিল নগর সত্যিই গড়ে উঠেছে। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা মায়ের আদর্শকে শিরোধার্য করে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছেন।

শ্রীমা সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। গানও জানতেন। ভালো অর্গান বাজাতে পারতেন। প্রতি বছরের শেষ দিন রাত বারোটার পর তিনি অর্গান বাজিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেন। বিভিন্ন রচনায় তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা ও কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম সারা ভারতে এক আদর্শ স্থান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এর আদর্শে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অরবিন্দ আশ্রম গড়ে ওঠে। বাংলাদেশেও অরবিন্দ আশ্রম রয়েছে। এই আশ্রমের আদর্শ ভারতবাসীদের জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছে।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

শ্রীমার জীবনাদর্শ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হলো: ব্যক্তিজীবনে পবিত্রতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, শিক্ষা ও সেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা। সামগ্রিকভাবে নৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভগবানের পূর্ণাবতার কে?

ক. মৎস্য খ. বরাহ
গ. নৃসিংহ ঘ. শ্রীকৃষ্ণ

২। চরক সংহিতা কয়টি ভাগে বিভক্ত?

ক. পাঁচ খ. ছয়
গ. সাত ঘ. আট

৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের কারণ হচ্ছে –

i. ধর্মকে সংস্থাপন
ii. দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন
iii. সজ্জনদের বিনাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। 'মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা'– এটি কার বাণী?

ক. শঙ্করাচার্য খ. বিজয়কৃষ্ণ
গ. নৃসিংহ ঘ. বিবেকানন্দ

৫। লোকনাথ বাবার নির্দেশে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কোথায় আশ্রম স্থাপন করেন?

ক. ঢাকা খ. বরিশাল
গ. যশোর ঘ. খুলনা

৬। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে কাকে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়?

ক. প্রভু নিত্যানন্দ খ. স্বামী বিবেকানন্দ
গ. শ্রীরামকৃষ্ণ ঘ. শ্রীঅরবিন্দ

২০২৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তমা লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে বাড়ির উঠানের একপাশে পাখিদের জন্য খাবার দিয়ে রাখে। পাখিরাও নিয়মিত এসে খেয়ে যায়। এতে সে পরম আনন্দ লাভ করে। হঠাৎ তমার বাবা তমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করলে তমা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবশেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের হস্তক্ষেপে তমার অধিকার রক্ষা পায়।

ক. বিবেকানন্দ 'বেদান্ত সমিতি' নামে একটি সংগঠন কোথায় স্থাপন করেন?

খ. শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিবেকানন্দের ভক্তিভাব গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. অনুচ্ছেদে তমার পাখিপ্রীতি স্বামী বিবেকানন্দের কোন মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত? তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের কোন আদর্শ তমার শিক্ষকের চরিত্রে এবং কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করো।

২। ধর্মবিষয়ক শিক্ষক দীনেশচন্দ্র নবম শ্রেণিতে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে এমন একজনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন, যিনি ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে একজন জ্ঞানতপস্বিনীর বেশ ধারণ করেন এবং একটি আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আশ্রমটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। এমনকি তার সৌন্দর্যবোধ ও অভাবনীয় পরিকল্পনায় একটি নগরও গড়ে ওঠে।

ক. শ্রী বিজয়কৃষ্ণের পিতার নাম কী?

খ. বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন?

গ. অনুচ্ছেদে ধর্মীয় শিক্ষক যে সাধক-সাধিকার কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন তাঁর সাধনজীবন তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নগর প্রতিষ্ঠায় উক্ত সাধক-সাধিকার অবদান মূল্যায়ন করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।
–শ্রী রামকৃষ্ণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।